ইসলামের মৌলিক নীতিমালা

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আস-সুহাইম

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা : ড. মুহাম্মদ আস-সুহাইম রচিত “ইসলামের মৌলিক নীতিমালা” বইটিতে সংক্ষেপে ইসলামের মূলস্তম্ভ, প্রধান মূলনীতিসমূহ, আর ইসলামের দিকে আহ্বানের সময় উল্লেখযোগ্য ও জরুরি কিছু বিষয় আলোচনার মাধ্যমে

ইসলামের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তুলে ধরা হয়েছে।

https://islamhouse.com/২৮২৯১৮৯

- ইসলামের মৌলিক নীতিমালা
  - সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............
  - ভূমিকা
  - সঠিক পথ কোনটি?
  - মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, প্রভূত্ব, একত্ব ও একক ইবাদাত প্রাপ্তির বর্ণনা[২]
  - মহাজগতের সৃষ্টি
  - মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য
  - মানব সৃষ্টি ও তার মর্যাদা
  - নারীর মর্যাদা

- মানব সৃষ্টির হিকমত
- মানুষের জন্য দীন-ধর্মের প্রয়োজনীয়তা
- সত্য দীনের চেনার উপায়
- দীন-ধর্মের বিবিধ প্রকার
- বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা
- নবুওয়াতের তাৎপর্য
- নবুওয়াতের নিদর্শনাবলি
- মানুষের জন্য রাসূলের প্রয়োজনীয়তা
- পরকাল বা আখেরাত
- রাসূলগণের দা‘ওয়াতের মূলনীতি
- চিরস্থায়ী রিসালাত[৫৮]
- খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

- ইসলাম পরিচিতি
- ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও তার উৎসসমূহ
- দীনের স্তরসমূহ
- ইসলামে ইবাদাতের সংজ্ঞা[৯৪]
- দীনের দ্বিতীয় স্তর: ঈমান[৯৭]
- দীনের তৃতীয় স্তর: ইহসান
- দীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলি*[১০৬]
- ইসলাম না গ্রহণ করার পরিণতি
- উপসংহার

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা

ড. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালহে আস-সুহাইম

অনুবাদক : জাকরেুল্লাহ আবুল খায়রে

সম্পাদনা : প্রফসের ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়িা

সংক্ষপি্ত বর্ণনা............

মহান আল্লাহ প্রদত্ত চরিন্তন পদ্ধতরি অনুসরণ করে তাঁর কতিাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নাতকে দলীল হসিবে গ্রহণ করে এ গ্রন্থটি আল্লাহর পথে আহ্বানরে উদ্দশ্যে রচনা করা হয়ছে। এতে মহাবশি্ব সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ও তার মর্যাদা, তাদরে নকিট রাসূল

প্রেরণ, সাবেক ধর্মগুলোর অবস্থা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ইসলামের অর্থ এবং রোকনসমূহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াত চায়, তার সামনে এগুলোই তার প্রমাণপঞ্জি। আর যে ব্যক্তি নাজাত বা মুক্তি চায়, তার জন্য সে পথের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের আত্মার যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে এবং

আমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের গুনাহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও অসংখ্য শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

অতঃপর...

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণকে বিশ্ববাসীর নিকট এজন্য প্রেরণ করেছেন, যেন তারা রাসূল আগমনের

পরে আল্লাহর দরবারে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে। আর তিনি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা হিদায়াত, রহমত, আলো এবং রোগমুক্তি। আর ইতোপূর্বে রাসূলগণকে বিশেষভাবে তাদের স্বজাতির নিকট প্রেরণ করা হতো এবং তারাই তাদের কিতাবসমূহকে হিফাযত করতেন। ফলে (তাদের মৃত্যুর পর) তাদের লেখাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তাদের শরী‘আতও বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। কারণ তা নির্দিষ্ট একটি জাতির নিকট এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন। তাঁকে তিনি সমস্ত নবী ও রাসূলগণের পরিসমাপ্তকারী ও শেষ নবী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ﴾ [الاحزاب : ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বোত্তম কিতাব ‘মহান আল কুরআন’ অবতীর্ণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহ

তা‘আলা নিজেই তার হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি এর হিফাযতের দায়িত্ব তাঁর কোনো সৃষ্টজীবের ওপর ছেড়ে দেননি। যেমন, তিনি বলেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমরা কুরআন[১] নাযিল করেছি, আর আমরাই তার হিফাযতকারী।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯] আল্লাহ তা‘আলা তাঁর শরী‘আতকে কিয়ামত অবধি স্থায়ী করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর শরী‘আত অবশিষ্ট থাকার আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হলো-

তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর দিকে আহ্বান করা, তাঁর ওপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও পদ্ধতি এবং তাঁর পরে তাঁর অনুসারীগণের পথ ও পদ্ধতি হলো, জেনে-বুঝে সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এই পদ্ধতির কথা আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে বলেন,

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٧]

“বল, ‘এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দিই এবং

যারা আমার অনুসরণ করছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮]

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পথে কষ্টের জন্য ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ٣٥﴾ [الاحقاف: ٣٥]

“সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠﴾ [ال عمران: ٢٠٠]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০]

মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই চিরন্তন পদ্ধতির অনুসরণ করে, আমি তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে এ গ্রন্থটি

আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে রচনা করি। এতে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ও তার মর্যাদা, তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ, সাবেক ধর্মগুলোর অবস্থা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। অতঃপর ইসলামের অর্থ এবং রোকনসমূহের পরিচয় তুলে ধরেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াত চায়, তার সামনে এগুলোই তার প্রমাণপঞ্জি। আর যে ব্যক্তি নাজাত বা মুক্তি চায়, তার জন্য আমি সে পথের বিশ্লেষণ করেছি। যারা নবী, রাসূল ও সৎ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়, তাদের জন্য পথ এটিই। আর যে ব্যক্তি তা পরিহার করে, সে একান্তই

নরি্বুদ্ধতিার পরচিয় দয়ে এবং সে পথভ্রষ্ট রাস্তার অনুসরণ করে।

প্রত্যকে ধর্মরে অনুসারীগণ, তারা তাদরে ধর্মরে দকিে মানুষকে আহ্বান করে এবং তারা দৃঢ় বশি্বাস রাখে যে, অন্যদরে তুলনায় হক বা সত্য তাদরে সাথইে রয়ছে (অর্থাৎ তারাই একমাত্র সত্যরে ওপর রয়ছে)। প্রত্যকে আকীদা-বশি্বাসী মানুষ অন্য মানুষকে তাদরে আকীদা-বশি্বাসরে ধারক-বাহকরে আকীদার অনুসরণ এবং তাদরে মতাবলম্বী দল নতোর প্রত সিম্মান প্রদর্শন করার দকিে আহ্বান করে।

পক্ষান্তরে কোনো মুসলমি কাউকে তার পথ অনুসরণ করার আহ্বান করে

না। কারণ, তার নির্দিষ্ট বা আলাদা কোনো পথ বা আদর্শ নেই। বরং তার দীন তো আল্লাহরই দীন, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ١٩﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯] সে কোনো মানুষকে সর্বমহান গণ্য দিকে আহ্বান করে না। কারণ, আল্লাহর দীনের সামনে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ছাড়া তাদের মাঝে কোনো

পার্থক্য নহৈ। বরং একজন মুসলমি মানুষকে তাদরে রবরে পথে অবলম্বন করতে, তাঁর রাসূলগণরে প্রতি ঈমান আনতে, আল্লাহ তাঁর সর্বশষে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রতি যে শরী‘আত অবতীর্ণ করছেনে এবং সকল মানুষরে নকিট তা পেৌঁছে দয়োর আদশে করছেনে, তা অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করনে।

বস্তুত এ কারণইে আল্লাহর মনোনীত দীন; যার প্রতি তনি সিন্তুষ্ট হয়ছেনে, যা দয়িে তনি সির্বশষে রাসূল প্ররেণ করছেনে, তার দকিে মানুষকে আহ্বানরে লক্ষ্যে, যে হদিায়াত চায় তাকে

পথপ্রদর্শন করা এবং যে মঙ্গল কামনা করে তার জন্য নির্দেশিকাস্বরূপ আমি এই কিতাব রচনা করেছি। আল্লাহর শপথ! একমাত্র এই দীন ব্যতীত কোনো সৃষ্টিকুলই প্রকৃত কল্যাণ বা সুখ পাবে না। আর যে ব্যক্তি রব হিসেবে আল্লাহর ওপর, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং দীন হিসেবে ইসলামের ওপর ঈমান-দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সত্যিকারের প্রশান্তি পাবে না। অতীত ও বর্তমান যুগে হাজার হাজার ইসলামের সুপথ প্রাপ্তগণ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম

গ্রহণ করার পরই প্রকৃত জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করা ছাড়া তারা প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি।

প্রত্যেক মানুষই কল্যাণের দিকে তাকিয়ে থাকে, প্রশান্তি অনুসন্ধান করে এবং এবং বাস্তবতা খুঁজে বেড়ায়। তাই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি, আর আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই আমলকে নির্ভেজালভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর পথের একজন দা'ঈ (আহ্বানকারী) হিসেবে গণ্য করেন। তিনি যেন এই কাজটিকে ঐসব সৎ আমলের

অন্তর্ভুক্ত করেন, যা তার সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকার পৌঁছায়।

আর যে বা যারা বইটি ছাপাতে অথবা যেকোনো ভাষাতে অনুবাদ করতে চায়, আমি তাদেরকে এর অনুমতি দিলাম। তবে শর্ত হলো, যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে, অনুবাদের ক্ষেত্রে যেন আমানতদারিতা রক্ষা করে। আর আমাকে অনুবাদের এক কপি দিয়ে তিনি যেন আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, যাতে করে তা হতে উপকার লাভ করতে পারি এবং একই পরিশ্রম যেন বারবার না করা হয়।

অনুরূপভাবে আমি আশা করি, যদি কারো কোনো প্রকার মন্তব্য অথবা সংশোধনী থাকে, চাই তা মূল আরবী কিতাব সম্পর্কে হোক অথবা এর যে কোনো ভাষায় অনুবাদিত কিতাব সম্পর্কে হোক, তিনি যেন আমাকে আমার নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছে দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, সর্বোপরে ও সর্বনিকটে। প্রকাশ্যে ও গোপনে, শুরু ও শেষে একমাত্র তাঁরই প্রশংসা। তাঁর জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আসমানসমূহ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং আমাদের রব অন্য যা কিছু চান, তা পূর্ণ করে দেন। হে

আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর সাহাবীগণের ওপর এবং যারা তাঁর পথ ও পন্থার ওপর চলে, তাদের সকলের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

লেখক

ড. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আস সুহাইম

রিয়াদ: ১৩/১০/১৪২০ হিজরী

পোষ্ট বক্স ১০৩২ রিয়াদ: ১৩৪২

পোষ্ট বক্স ৬২৪৯, রিয়াদ: ১১৪৪২

সঠিক পথ কোনটি?

মানুষ যখন বড় হতে শুরু করে এবং বুঝতে শিখে তখন তার মাথায় বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে। যেমন, আমি কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, আবার কোথায় আমার গন্তব্য? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কে আমার আশপাশের পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, কে এই পৃথিবীর মালিক এবং কে এ পৃথিবী পরিচালক? এ ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খায়।

মানুষ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজেই জানতে পারে না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেয়ার মত উন্নতি লাভ

করেনি। কারণ, এগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো দীনের গণ্ডিভুক্ত ও তার সীমারেখার বিষয়। এ কারণেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে রয়েছে একাধিক বর্ণনা, বিভিন্ন কুসংস্কার ও অসংখ্য রূপকথা রচিত হয়েছে, যা মানুষের হতভম্বতা ও দুশ্চিন্তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত একজন মানুষ এ বিষয়গুলোর পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট উত্তর তখনই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে এমন সঠিক দীনের পথ প্রদর্শন করবেন, যে দীন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং এ ধরনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

কারণ, এ বিষয়গুলো এমনই বিষয় যেগুলো গায়বী তথা অদৃশ্য বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। সঠিক দীনই শুধুমাত্র সত্য, সঠিক ও হকের কথা বলে। কেননা, দীন এককভাবে কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে আল্লাহ তা‘আলা তার নবী ও রাসূলগণের নিকট অহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কারণেই প্রত্যেক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক হলো, সঠিক দীন অন্বেষণ করা, দীনের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা। যাতে করে তার থেকে সন্দেহ, সংশয় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হয় এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

প্রিয় পাঠক! নিম্নোক্ত পাতাগুলোতে আমি আপনাকে মহান আল্লাহর একমাত্র সঠিক পথের অনুসরণ করতে আহ্বান করবো এবং সাথে সাথে আপনার সামনে এর কতক অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উল্লেখ করবো। যাতে করে আপনি মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে বিষয়গুলো খেয়াল করেন।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, এককত্ব ও একক ইবাদাত প্রাপ্তির বর্ণনা[২]

কাফিররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের বানানো উপাস্য ও সৃষ্টি অর্থাৎ গাছ-পালা, পাথর এবং মানুষের উপাসনা করে

থাকে। আর এজন্যই ইয়াহূদী ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলি বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এবং তিনি কোত্থেকে আসলেন তাও জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পরিচয় জানিয়ে নিচের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الاخلاص: ١، ٥]

“(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর

তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-4] আর তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الاعراف: ٥٣]

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত,

তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ ٢ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۡهَٰرٗاۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٣﴾ [الرعد: ٢، ٣]

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখেছ। তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন

করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২, ৩] অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۚ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ٨ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ ٩﴾ [الرعد: ٨، ٩]

“প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৮, ৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗاۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِي ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُۗ أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ

كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ
وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ١٦﴾ [الرعد: ١٦]

“বলুন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব?’ বলুন, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, ‘তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?’ বলুন, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে?’ তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, ‘আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহা

প্রতাপশালী’।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৬]

আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য তাঁর প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহকে সাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمۡ لَا يَسۡـَٔمُونَ۩ ٣٨ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلۡأَرۡضَ خَٰشِعَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩﴾ [فصلت: ٣٧، ٣٩]

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা

সূর্যকে সাজদাহ করো না, চাঁদকেও নয়; আর সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর। আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক ও ঊষর, অতঃপর যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭-৩৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ
أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢
وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبۡتِغَآؤُكُم مِّن
فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَسۡمَعُونَ ٢٣﴾
[الروم: ٢٢، ٢٣]

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কাওমের জন্য যারা শুনে। সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা

ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২২, ২৩]

মহান আল্লাহ নিজের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বর্ণনা করে বলেছেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়।

আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু’টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]

তিনি অন্য আয়াতে আরও বলেন,

﴿غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوۡبِ شَدِيدِ ٱلۡعِقَابِ ذِي ٱلطَّوۡلِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ إِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣﴾ [غافر:٣]

“তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। একমাত্র তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٢٣﴾ [الحشر: ٢٣]

“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহা পবিত্র,

ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা থেকে পবিত্র, মহান।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

এই মহান উপাস্য, প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাশালী রব যিনি তাঁর বান্দাদেরকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে অবগত করলেন এবং তাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহকে সাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করলেন। আর তিনি নিজে তার পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা ঘোষণা করলেন। এসবই হলো তাঁর অস্তিত্ব, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের প্রমাণ ও

সাক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরী‘আত এমনকি বিবেক শক্তি ও সৃষ্টিগত ফিতরাত বা স্বভাবিক মানব প্রকৃতিও এর সাক্ষ্য দেয়। সমগ্র জাতিগোষ্ঠীও এ বিষয়ে একমত। আমি এখন এর সামান্য কিছু দলীল-প্রমাণ আপনার সামনে তুলে ধরবো। প্রথমে তার অস্তিত্ব ও রুবুবিয়্যাতের প্রমাণ যা নিম্নে আলোচনা করা হবে:

এক- সৃষ্টিজগত ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে, যা অভিনব হিসেবে স্বীকৃত:

হে মানব! বিশাল সৃষ্টিজগত আপনাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আকাশমণ্ডলী, নক্ষত্ররাজি, ছায়াপথ

ও বিস্তৃত যমীন নিয়ে এই সৃষ্টিজগত। আর এই যমীনের পাশাপাশি অসংখ্য ভূখণ্ড রয়েছে এবং প্রত্যেক ভূখণ্ডের উৎপাদন অন্যের চেয়ে ভিন্ন। এতে রয়েছে নানা জাতের ফল ফলাদি। দেখতে পাবেন এখানে প্রত্যেক সৃষ্টিকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এই বিশ্বজগত নিজে নিজেই সৃজিত হয়নি। এর জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা, কেউ নিজেকে নিজে সৃজন করতে পারে না। সুতরাং অভিনব পদ্ধতিতে কে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন? কে এটিকে এত সুন্দর পূর্ণতা দান করেছেন? এবং কে দর্শকদের জন্য তা নিদর্শন করেছেন? উত্তরে

যার নাম উঠে আসবে তা হচ্ছে, তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী, একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। যিনি ছাড়া অন্য কোনো রব নেই, আর প্রকৃত কোনো উপাস্যও নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦﴾ [الطور: ٣٤، ٣٥]

“তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না।” [সূরা আত-তূর, আয়াত: ৩৫, ৩৬]

উল্লেখিত দু’টি আয়াত তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১- তারা কি অস্তিত্বহীন কারো মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে?

২- নাকি তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের সৃষ্টি করেছে?

৩- তারা নিজেরাই কি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে?

যদি কোনো অস্তিত্বহীনতা তাদেরকে সৃষ্টি না করে থাকে, আর তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি না করে থাকে , আবার আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তাও তারা না হয়, তবে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা

আবশ্যক হয়ে পড়ে; যিনি তাদেরে এবং আসমানসমূহ ও যমীনেরে সৃষ্টিকর্তা। আর সেই সৃষ্টিকর্তা হলেন একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

দুই- ফিতরাত (বা সুস্থ মানব প্রকৃতি):

সৃষ্টিকুল স্বভাবগতভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। আরও স্বীকৃতি দেয় যে, তিনি সকলের চেয়ে সুমহান, সর্ববৃহৎ, মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতম। এই ব্যাপারটি মানব ফিতরাতেরে মধ্যে গাণিতিকি বিষয়েরে শক্ত ভিত্তিরি চেয়ে মজবুতভাবে গড়েে দেয়া হয়েছে। বস্তুত তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণেরে জন্য কোনো দলীল

উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না; কিন্তু যার সুস্থ মানব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং এমন কিছু পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, যা তার মধ্যে এ চিরন্তন সত্যটিকে মেনে নেয়ার বিপরীতে অবস্থান তৈরী করে দিয়েছে। (তার ক্ষেত্রে দলীল প্রয়োজন।)[৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠﴾ [الروم: ٣٠]

“কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা

দীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾ [الروم: ٣٠] الآيَةَ

“প্রতিটি নবজাত সন্তান ফিতরাতের ওপর (দীন ইসলাম নিয়ে) জন্মগ্রহণ

করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতা-মাতাই তাকে ইয়াহূদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেমন জীবজন্তু নিখুঁত শাবক প্রসব করে, তুমি কি সেখানে কোনো ত্রুটিযুক্ত শাবক দেখতে পাও?” তারপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পার- ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾ “আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।”[৪]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا».

“জেনে রাখ, আমার রব আমাকে যে সব তথ্য প্রদান করেছেন তন্মধ্যে যা তোমরা জান না, তা তোমাদেরকে জানানোর নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি আমাকে আজকে যা জানিয়েছেন তার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, ‘আমি কোনো বান্দাকে যে

সম্পদ দান করেছি তা তার জন্য হালাল আর আমি আমার সকল বান্দাকেই শির্ক-কুফুরীবিমুখ হয়ে একনিষ্ঠ তাওহীদমুখী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দীন থেকে দূরে নিক্ষেপ করল। আমি যা তাদের জন্য হালাল করেছি তা তারা তাদের ওপর হারাম করল এবং কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকেই আমার সাথে অংশীদার করতে নির্দেশ দিল।"[৫]

তিন- সকল জাতির ইজমা' বা ঐকমত্য:

প্রাচীন ও আধুনিক কালের সকল উম্মত একমত যে, এই বিশ্ব পরিমণ্ডলের একজন সৃষ্টিকর্তা

আছেন। তিনি হলেন এ জগতের একমাত্র আল্লাহ সমগ্র জগতের রব। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টিতে কারো অংশীদারীত্ব নেই, যেমন তাঁর রাজত্বে কোনো ভাগীদার নেই।

পূর্বের কোনো জাতি (যারা বিভিন্ন উপাস্যের ইবাদাত করত) এই বিশ্বাস পোষণ করত না যে, তাদের উপাস্যগুলো আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার ছিল। বরং তারা বিশ্বাস করত যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই তাদের এবং তাদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো

সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা নেই। কল্যাণ ও অকল্যাণ কেবল তাঁরই হাতে।[৬]

আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাতকে মুশরিকরা যে স্বীকার করে নিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٦١ ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٦٢ وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٦٣﴾ [العنكبوت: ٦١، ٦٣]

“আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে

নিয়ন্ত্রিত করছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্’। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। বলুন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই’। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন করে না।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬১-৬৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ ٩﴾ [الزخرف:٩]

"আর (হে নবী) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে?' তারা অবশ্যই বলবে, 'এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই'।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৯]

চার- বিবেকের অপরিহার্য দাবি:

সব বিবেক শক্তি এক যোগে স্বীকৃতি দিয়ে যে, এই জগতের একজন মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন। কারণ, বিবেক এই জগতকে একটি সৃষ্ট ও নতুন জিনিস

মনে করে। আরও বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকুল নিজেকে নিজে অস্তিত্ব আনয়ন করেনি। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, প্রত্যেক সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা থাকেন।

মানুষ জানে যে, সে বিভিন্ন সময়ে নানা বিপদ ও জটিলতার সম্মুখীন হয়। আর যখন সে তা নিজে সমাধান করতে পারে না, তখন একনিষ্ঠভাবে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার রবের কাছে সাহায্য চায়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য; যদিও সে আজীবন তার রবকে অস্বীকার করুক এবং মূর্তির উপাসনা করে যাক। কারণ, এটা এমন এক অত্যাবশ্যক বিষয় যা অস্বীকার করার

সুযোগ নেই। এটাকে স্বীকার করতেই হয়। এমনকি জীব-জন্তুর ওপরও কোনো বিপদ আসলে তারা আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকায়। নিচের আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ এ ধরনের বিপদগ্রস্ত মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে যখন সে তার রবের কাছে দ্রুত মুক্তির জন্য সাহায্য চায়, তখন সে আল্লাহকেই ডাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيۡهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعۡمَةٗ مِّنۡهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدۡعُوٓاْ إِلَيۡهِ مِن قَبۡلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادٗا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦۚ قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ ٨﴾ [الزمر: ٨]

“আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অন্যকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, ‘কুফুরীর জীবন তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত’।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৮]

মহান আল্লাহ মুশরিকদের অবস্থা তুলে ধরে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمۡ
فِي ٱلۡفُلۡكِ وَجَرَيۡنَ بِهِم بِرِيحٖ طَيِّبَةٖ وَفَرِحُواْ بِهَا
جَآءَتۡهَا رِيحٌ عَاصِفٞ وَجَآءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ مَكَانٖ
وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ
لَئِنۡ أَنجَيۡتَنَا مِنۡ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٢٢ فَلَمَّآ
أَنجَىٰهُمۡ إِذَا هُمۡ يَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۗ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۖ مَّتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ
إِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٣﴾ [يونس
: ٢٢، ٢٣]

“তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল

তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়ছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলে: ‘আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব’। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের সীমালঙ্ঘন কেবল তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে; দুনিয়ার জীবনের সুখ ভোগ করে নাও, পরে আমাদেরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমরা

তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা যা করতে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২২, ২৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوۡجٞ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ فَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٖ كَفُورٖ ٣٢﴾ [لقمان: ٣٢]

“আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ছায়ার মতো, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি পথে থাকে; আর শুধু বিশ্বাসঘাতক, কাফির ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলিকে

অস্বীকার করে।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ৩২]

[ইলাহ বা উপাস্যও একজনই হবেন]

মহান রব যিনি এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীন থেকে, আর মানুষকে তৈরি করেছেন সর্বাধিক সুন্দর গঠন দিয়ে এবং তার ফিতরাত তথা প্রকৃতিতে গেথে দিয়েছেন তাঁর দাসত্ব ও আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা। সকল বিবেক তাঁর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের আনুগত্য করেছে এবং সমস্ত উম্মত তাঁর রুবুবিয়্যাতকে এক বাক্যে মেনে নিতে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে একজনই সত্তা

হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টিতে কোনো অংশীদার নেই, তেমনিভাবে তাঁর ইবাদতেও কোনো ভাগীদার নেই। এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান[৭]। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হলো:

এক- এই জগতে প্রকৃত মা‘বুদ শুধুমাত্র একজনই আছেন। তিনি ছাড়া সত্যিকার কোনো মা‘বুদ নেই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া কেউ উপকার করতে পারে না এবং তিনি ছাড়া কেউ ক্ষতিকে প্রতিহত করতে পারে না। যদি এই পৃথিবীতে অন্য

আরেকজন মা‘বুদ থাকত তবে তারও কাজ, সৃষ্টি ও নির্দেশাবলি থাকত। এতে করে একজন অন্যজনের অংশগ্রহণকে মেনে নিতে পারতো না।[৮] তদুপরি একজনের শক্তি ও ক্ষমতা অন্যজনের চেয়ে বেশি থাকত। অক্ষম, পরাস্ত কখনও মা‘বুদ হতে পারে না। তিনিই প্রকৃত মা‘বুদ যিনি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী; যার ইবাদাতে অপর কোনো মা‘বুদ অংশীদার হতে পারে না যেমনিভাবে তাঁর রুবুবিয়্যাত তথা প্রভুত্বে কোনো মা‘বুদ অংশীদার নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١﴾ [المؤمنون : ٩١]

“আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র-মহান!” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৯১]

দুই- ইবাদাতের হকদার কেবল আল্লাহ তা‘আলা, যার জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা ও কর্তৃত্ব। কেননা মানুষ এমন মা‘বুদের নৈকট্য অর্জন করতে চায়, যিনি তার সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারেন এবং যাবতীয় দুঃখ,

দুর্দশা ও অনিষ্ট দূরীভূত করার ক্ষমতা রাখেন। আর এটা সেই মহান সত্তার পক্ষেই সম্ভব যিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তার সবকিছুর মালিক। যদি তাঁর সঙ্গে একাধিক মা‘বুদ থাকতো, যেমনটি মুশরিকদের ধারণা, তাহলে সেসব বান্দারা কেবল সত্য রব আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য বিবিধ উপায় খুঁজে বেড়াতো; কারণ এ সকল মা‘বুদ শুধুমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদাত করত ও তাঁরই নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট থাকত। সুতরাং যার হাতে কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি, এমন সত্য সত্তার যে নৈকট্য লাভ করতে চায়, তাকে সত্য মা‘বুদ আল্লাহরই

ইবাদাত করতে হবে। যার ইবাদাত করে থাকে আসমানসমূহ, যমীন এবং এতদুভয়ের সকল মাখলুকাত। আর এসব অসত্য মা‘বুদগুলো তাঁর দাসদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٞ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ٤٢﴾ [الاسراء: ٤٢]

“(হে নবী) আপনি বলুন: তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে আরও মা‘বুদ থাকতো তবে তারা ‘আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার উপায় অন্বেষণ করতো।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪২] সত্য অনুসন্ধানকারীর জন্য উচিত সে যেন নীচের আয়াতগুলো পড়ে-

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ [سبأ: ٢٢، ٢٣]

“(হে নবী আপনি) বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু’টিতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয়’। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২২, ২৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে গাইরুল্লাহ’র সাথে অন্তরের সম্পর্ককে চারটি বিষয় দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। আর তা নিম্নরূপ:

প্রথমত: এসব অংশীদারগণ আল্লাহর সাথে বিন্দু পরিমাণ বস্তুর মালিক না। আর যে কেউ বিন্দু পরিমাণ বস্তুর মালিক না, সে কোনো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। সে মা‘বুদ হওয়ার যোগ্য নয় এবং আল্লাহর সঙ্গে কোনো কাজে অংশীদার হওয়ারও যোগ্য নয়; বরং মহান আল্লাহই তাদের মালিক এবং তাদের দেখাশুনা করেন।

দ্বিতীয়ত: তারা আসমানসমূহ ও যমীনের কোনো অংশের মালিক নয় এবং উভয়ের মাঝে তাদের তিল পরিমাণ অংশীদারিত্বও নেই।

তৃতীয়ত: সৃষ্টির কেউ মহান আল্লাহর সাহায্যকারী নয়। বরং তিনিই তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। যেমন, তিনি তাদের যাবতীয় কল্যাণ সাধন করেন এবং সব অকল্যাণ দূরীভূত করেন। তিনি অমুখাপেক্ষী এবং সৃষ্টির সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

চতুর্থত: এসব অংশীদারগণ তাদের অনুসারীদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা‘আত বা সুপারিশের অধিকার রাখে না। আর তাদেরকে সুপারিশ করার

অনুমতিও দেয়া হবে না। সুপারিশের অনুমতি কেবল আল্লাহ তা‘আলার ওলীদের[৯] জন্য নির্ধারিত। তবে ওলীগণ তাদের জন্যই সুপারিশ করতে পারবে, যাদের কথা, কাজ ও আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট।[১০]

তিনি- জগতের সবকিছুর শৃঙ্খলা এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনাই সর্বোচ্চ প্রমাণ যে, এ জগতের পরিচালক এক ইলাহ, এক মালিক ও এক রব। তিনি ছাড়া সৃষ্টির আর কোনো মা‘বুদও নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের আর কোনো রব নেই। সুতরাং যেমনিভাবে জগতের দু’জন সৃষ্টিকর্তা কল্পনা করা

যায় না, তেমনিভাবে দুই বা ততোধিক মা‘বুদের অস্তিত্বও ভাবা অমূলক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ﴾ [الانبياء: ٢٢]

“যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃঙ্খল হত।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২]

সুতরাং যদি মেনে নেয়া হয় যে, আসমানসমূহ ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা‘বুদ আছে, তবে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।[১১] আর এই বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ হলো: যদি আল্লাহর সঙ্গে অন্য অন্য

কোনো মা‘বুদ থাকতো, তবে অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতা ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের চেয়ে শক্তিশালী হতো। আর এতে ঝগড়া ও মতভেদ তৈরি হতো এবং ফিতনা-ফ্যাসাদের আবির্ভাব ঘটত।[১২]

যদি একটি দেহে বা শরীরের পরিচালনার দায়িত্বে একই রকম দু’টি আত্মার থাকতো, তবে দেহ ধ্বংস হয়ে যেত। যদি এটা অসম্ভব হয়, তাহলে এই বিশাল পৃথিবীর ক্ষেত্রে দু’জন বা ততোধিক পরিচালক কীভাবে কল্পনা করা যায়![১৩]

চার- এ বিষয়ের ওপর সমগ্র নবী ও রাসূলগণের ইজমা‘:

উম্মতগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, নবী ও রাসূলগণ হলেন পূর্ণ বিবেকবান মানুষ, পাক-পবিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, তাদের অধীনস্থদের কল্যাণকামী, আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা সম্পর্কে তারা সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত এবং সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দানকারী। কেননা তারা সরাসরি মহান আল্লাহর নিকট থেকে অহী প্রাপ্ত হন, তারপর তা মানুষের মাঝে প্রচার করেন। প্রথম নবী আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সবাই আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করেছেন এবং তিনি ছাড়া

অন্যের ইবাদাত পরিত্যাগ করার দা‘ওয়াত দিয়েছিলেন। আর তিনিই প্রকৃত মা‘বুদ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء:٢٥]

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস সালামের তাওহীদের প্রতি দাও‘য়াত

দেয়ার কথা উল্লেখ করেন; তিনি তার উম্মতকে বলছিলেন যে,

﴿أَن لَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ أَلِيمٖ ٢٦﴾ [هود: ٢٦]

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না, আমি তোমাদের ওপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।” [সূরা হূদ, আয়াত: ২৬]

শেষে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর উম্মতকে বলছিলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٨﴾ [الانبياء: ١٠٨]

“(হে নবী আপনি) বলুন, আমার প্রতি অহী হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের মা‘বুদ শুধুমাত্র একজনই। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৮]

এই মহান মা‘বুদ, যিনি এই জগতকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করে অসাধারণ রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে তৈরি করে সম্মানিত করেছেন এবং তার ফিতরাতে প্রভূত্ব (রুবুবিয়্যাত)কে মেনে নেওয়া ও উলুহিয়্যাত তথা ইবাদতকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করাকে

স্বীকৃতি দেয়ার যোগ্যতা স্থাপন করেছেন। তিনি তার আত্মাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সে তার মহান সৃষ্টিকর্তা-আল্লাহর অনুগত না হলে, তাঁর নির্দেশ মতো না চললে তা স্থির থাকে না। আর তার রূহের জন্য ধার্য করেছেন যে, সে কখনও প্রশান্তি লাভ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট আশ্রয় না নিবে এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা না করবে। আর তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা কেবল তাঁর সঠিক পথ গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব, যার প্রচার ও প্রসার করেছিলেন সম্মানিত রাসূলগণ। আর তিনি মানুষকে আরেকটি মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন, তা হলো: বিবেক-

শক্তি; যে বিবেকের যাবতীয় কার্য তখনই পরিপূর্ণ স্থির থাকবে, স্বীয় দায়িত্ব পালনে কার্যকর হবে, যখন সে বিবেক তার রবের প্রতি পূর্ণ ঈমান পোষণ করবে।

সুতরাং যখনই কারো ফিতরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতি সঠিক হবে, রূহ (আত্মা) প্রশান্তচিত্ত হবে, মন স্থির হবে আর বিবেক আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, তখনই কেবল একজন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর মানুষ যদি এগুলো অস্বীকার করে, তবে পৃথিবীর অলিতে-গলিতে পাগলের মতো উন্মাদ হয়ে

জীবন-যাপন করবে, অনেকে উপাস্যের মাঝে নিজেকে বণ্টন করে নিতে বাধ্য হবে, তখন সে জানতে পারবে না যে, কে তার উপকার সাধন করবে আর কে তার বিপদাপদ দূর করবে। আত্মার মধ্যে ঈমানকে স্থির করতে এবং কুফরের নোংরামি প্রকাশ করার জন্য মহান আল্লাহ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কেননা উদাহরণের মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট হয়। এর মধ্যে দু’জন লোকের মাঝে তুলনা করা হয়েছে; একজন তার কাজ কর্ম বহু প্রভুর মাঝে বণ্টন করে (বহু প্রভুর ইবাদাত করে) আর অন্যজন শুধুমাত্র এক প্রভুর ইবাদাত করে তারা কি সমান? কখনই না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلٗا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلٗا سَلَمٗا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٩﴾ [الزمر: ٢٩]

“আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ দু‘জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তা‘আলা অত্র আয়াতে তাওহীদপন্থী বান্দা ও মুশরিক বান্দার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তির মালিক অনেকগুলো। সবাই তাকে নিয়ে

টানা হেঁচড়া করে, নিজের অনুগত বলে দাবী করে, সে তাদের মাঝে বিভক্ত, তাদের প্রত্যেকেই তার ওপর নিজের দিক-নির্দেশনা ও দায়িত্ব অর্পণ করতে চায়। এমতাবস্থায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং এক পথ বা মতের ওপর চলতে পারে না। ফলে সে তাদের ঝগড়াটে, বিতর্কপূর্ণ ও স্ববিরোধী প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এতে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও শক্তি সামর্থ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। অপর পক্ষে অন্য একজন বান্দা যার মালিক শুধুমাত্র একজন, সে জানে যে তার মালিক তার থেকে কি চায় এবং কি দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করে। এতে করে সে সুস্পষ্ট এক নীতির ওপর

স্থির থাকতে পারে। সুতরাং আলোচিত দু’জন বান্দা এক সমান নয়। একজন এক মালিকের অনুগত হয়ে সততা, জ্ঞান ও নিশ্চয়তার প্রশান্তি লাভ করে। আর অপরজন পরস্পর বিরোধী অনেকগুলো মালিকের ইবাদাত করে অতিষ্ঠপূর্ণ জীবন-যাপন করে। কোনো অবস্থায়-ই সে স্থির থাকতে পারে না। তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করা তো দূরের কথা বরং তাদের একজনকেও সে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একমাত্র তাঁরই প্রভুত্ব (রুবুবিয়্যাত) ও তাঁরই দাসত্বের (উলুহিয়্যাতের) বিষয়টি যখন

প্রমাণিত হলো, তখন আমাদের জানা দরকার এই বিশ্বপরিমণ্ডল ও মানবের সৃষ্টি সম্পর্কে এবং সৃষ্টির অজানা কারণ ও রহস্য কী তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

মহাজগতের সৃষ্টি

মহান আল্লাহ এই বিশাল জগতকে, তার আসমানসমূহ, যমীন, নক্ষত্র, সমুদ্র, গাছপালা ও সমস্ত প্রাণীজগৎ, এসবকে অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ أَئِنَّكُمۡ لَتَكۡفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَرۡضَ فِي يَوۡمَيۡنِ
وَتَجۡعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادٗاۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَٰسِيَ مِن فَوۡقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقۡوَٰتَهَا فِيٓ
أَرۡبَعَةِ أَيَّامٖ سَوَآءٗ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى

ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡأَرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا
أَوۡ كَرۡهٗا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ ١١ فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ
سَمَٰوَاتٖ فِي يَوۡمَيۡنِ وَأَوۡحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمۡرَهَاۚ
وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفۡظٗاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ
ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ١٢﴾ [فصلت: ٩، ١٢]

“বলুন, ‘তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফুরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন দু’দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরি করছ? তিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে যাচ্ঞাকারীদের জন্য। তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি

ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।’ তারা বলল, ‘আমরা আসলাম অনুগত হয়ে’। অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু’ দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ অহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।” [সূরা আল-ফুসসিলাত, আয়াত: ৯-১২] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا
رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۚ أَفَلَا
يُؤۡمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ
بِهِمۡ وَجَعَلۡنَا فِيهَا فِجَاجٗا سُبُلٗا لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ ٣١
وَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ سَقۡفٗا مَّحۡفُوظٗاۖ وَهُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهَا
مُعۡرِضُونَ ٣٢﴾ [الانبياء: ٣٠، ٣٢]

“যারা কুফুরী করে তারা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? আর আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক চলে না যায় এবং আমরা সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে

তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩০-৩২][১৪]

এই বিশাল বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করার পিছনে মহান আল্লাহর অসংখ্য হিকমত-প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ নিহিত। যা বর্ণনা করে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এর প্রতিটি অংশই মহান হিকমতে ভরপুর। আপনি যদি এর যেকোনো একটি নিদর্শন নিয়ে ভাবেন, তাতেই অনেক অবাক করা বিষয় খুঁজে পাবেন। আপনি বৃক্ষলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে

আল্লাহ তা‘আলার কারুকার্যতার দিকে দেখুন; যার একটি পাতা, শেকড় ও ফল উপকার থেকে খালি নয়। কিন্তু মানুষের চিন্তা শক্তি এগুলোর উপকারিতা ও বিস্তারিত দিক আয়ত্ব করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর সেই নরম, ক্ষীণ ও দুর্বল শেকড় যেগুলোকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকলে দেখা যায় না, সেগুলোতে পানির গতিপথের দিকে তাকিয়ে দেখুন! কীভাবে সেগুলো নিচ থেকে উপরে পানি টেনে শক্তিশালী হচ্ছে। তারপর শেকড়গুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা অনুসারে পানি স্থানান্তরিত হচ্ছে। এরপর শেকড়গুলো বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এমন এক সীমায় পৌঁছে যে,

দৃষ্টি দিয়ে তা দেখা সম্ভব হয় না। আপনি গাছের চারা গঠন ও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে দেখুন! সেটো যেন দৃষ্টির আড়ালে লুকায়িত গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থার পরিবর্তনের মতো। কখনও আপনি তাকে দেখবেন বস্ত্রহীন একটি জ্বালানী কাঠের মতো; তারপরই তার রব ও স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা সেটোকে পাতা দ্বারা সুন্দরভাবে পোশাক দিয়ে আবৃত করে দেন। দুর্বল চারা সংরক্ষণের জন্য এবং অপরিপক্ব ফল-ফলাদির পোশাক হিসেবে পাতা বের করেন, যাতে করে সেগুলো পাতার মাধ্যমে গরম, ঠাণ্ডা ও বিভিন্ন প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

অতঃপর ওর ভেতর থেকে দুর্বল ও ক্ষীণাকারে অঙ্কুর প্রস্ফুটিত করেন। তারপর ঐ সমস্ত ফল-ফলাদির খাদ্য-খোরাক তিনি গাছের শিকড় ও গতিপথে চালিয়ে দেন। ফলে সেখান থেকে তারা খাদ্য আহরণ করতে থাকে যেমনিভাবে শিশু তার মায়ের দুগ্ধ থেকে খাদ্য আহরণ করে। এভাবে মহান আল্লাহ সেটাকে প্রতিপালন ও বড় করতে থাকেন। অবশেষে যখন তা পরিপক্ব হয়ে খাবারের উপযোগী হয়, তখন তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সেই বোবা জড় কাঠ হতে টাটকা সুস্বাদু ফল রিযিক হিসেবে দান করেন।

আর আপনি যদি যমীনের দিকে তাকান, একে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে দেখতে পাবেন যে সেটা মহান সৃষ্টিকর্তার এক বড় নিদর্শন। তিনি যমীনকে বিছানা ও বিশ্রামস্থল হিসেবে তৈরি করেছেন এবং বান্দাদের জন্য তা অনুগত করে দিয়েছেন। এর মাঝেই তিনি তাদের রিযিক, খাদ্য এবং জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ রেখে দিয়েছেন। আর তাতে বানিয়েছেন অনেকগুলো পথ, যাতে করে তারা সব ধরনের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে সহজেই চলাফেরা করতে পারে। আর তাতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে মজবুত করেছেন, যাতে করে তা নড়াচড়া করতে

না পারে। যমীনের বক্ষকে করেছেন বিস্তৃত এবং যমীনকে বিছিয়ে প্রসারিত করেছেন। এর উপরিভাগকে করেছেন জীবিতদের মিলনমেলা এবং অভ্যন্তর ভাগকে মৃতদের জন্য একত্রিত হওয়ার জায়গা। অর্থাৎ উপরিভাগ হলো জীবিতদের এবং অভ্যন্তর ভাগ হলো মৃতদের বাসস্থান। তারপর খেয়াল করুন চলমান কক্ষপথের দিকে, কীভাবে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিনিয়িত প্রদক্ষিণ করে চলছে। এর ভাঁজেই আছে রাত-দিনের, ঋতুসমূহের এবং গরম-ঠাণ্ডার বিবর্তন। আর এর মধ্যে আছে যমীনের সকল জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি, গাছ-পালা ও তৃণলতার নানা ধরনের উপকার।

তারপর আকাশ সৃষ্টি নিয়ে ভাবুন, বারবার দৃষ্টি ফেরান, তাহলে দেখতে পাবেন: তা উচ্চতায়, প্রশস্ততায় ও সুস্থিরতায় আল্লাহ তা‘আলার বড় একটি নিদর্শন। যার নিচে কোনো খুঁটি নেই এবং উপরের কোনো কিছুর সাথেও সম্পৃক্ততা নেই; বরং আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমতায় তা ঝুলন্ত আছে। যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রেখেছেন, যাতে করে তা বিলুপ্ত না হয়ে যায়।

আপনি যদি এই পৃথিবী এবং এর অংশগুলোর গঠন ও সুন্দর পন্থায় বিন্যাসের দিকে তাকিয়ে দেখেন, ‘‘যা তার সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা,

পূর্ণজ্ঞান, সূক্ষ্ম হিকমতের প্রতীক’’, তাহলে আপনি এটিকে তৈরিকৃত একটি বাড়ির মতো পাবেন। যেখানে সব ধরনের যন্ত্রপাতি, উপকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। আসমানসমূহ যেন এই পৃথিবী নামক গৃহের ছাদ, আর যমীন পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য বিছানা এবং বিশ্রামাগার ও বাসস্থান। সূর্য ও চন্দ্র দু’টি প্রদীপ হয়ে আলো দিচ্ছে, আর নক্ষত্ররাজি তার লাইট ও সৌন্দর্য বর্ধনের যন্ত্র। এগুলো এই আস্তানার পথিককে পথ দেখাচ্ছে। আর প্রস্তুতকৃত সম্পদের মতোই এর ভিতর লুকিয়ে আছে মণি মাণিক্য-জহরত ও খনিজ সম্পদ ধন-ভাণ্ডার।

এসবের প্রত্যেকটি যে জন্য প্রযোজ্য সে জন্য রাখা আছে। বিভিন্ন ধরনের গাছ-পালা, তৃণলতা তার প্রয়োজন পূরণার্থে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নানা জাতের জীব-জানোয়ার তার সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য তৈরী করে রাখা। এগুলোর কিছু আছে আরোহণের জন্য, কিছু দুগ্ধ প্রদানকারী, কিছু গোশত খাওয়ার, কিছু আছে যার চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি হয় এবং কিছু আছে প্রহরীর কাজ করে। আর এ ক্ষেত্রে মানুষকে তিনি করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক এবং তাতে কর্ম ও হুকুম প্রদানের অধিকারী।

আপনি যদি সমগ্র জগত অথবা এর একটি অংশ নিয়ে ভাবেন, তাহলে এতে আশ্চর্য ধরনের সব জিনিস দেখতে পাবেন। পূর্ণ মনোযোগের সাথে যদি দেখেন, সুবিচার করেন এবং প্রবৃত্তি ও অন্ধ অনুকরণের জাল থেকে মুক্ত থাকেন, তবে সু-নিশ্চিতরূপে জানতে পারবেন; এই পৃথিবী হলো সৃষ্ট। মহা প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাধর, মহাজ্ঞানী এক সত্তা এর সৃষ্টিকর্তা। সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে তিনি একে তৈরি করেছেন। আরও বুঝতে পারবেন যে, সৃষ্টিকর্তা দু’জন হবে এটা অসম্ভব; বরং মা‘বুদ একজনই, তিনি ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নেই। যদি আসমানসমূহ ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা‘বুদ

থাকতো, তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত, সব ধরনের কল্যাণমূলক কাজ থেমে যেত।

আর যদি অস্বীকার করে সৃষ্টিকে তার স্রষ্টা ছাড়া অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন, তাহলে নদীতে রাখা এমন একটি সেচযন্ত্র সম্পর্কে কী বলবেন; যার যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত সুদৃঢ়, যন্ত্রগুলো সুন্দরভাবে যথাস্থানে স্থাপন করে অত্যন্ত মজবুত করে গঠন করা হয়েছে। কোনো দর্শক তার গঠনে ও আকৃতিতে কোনো ত্রুটি খুঁজে পায় না। এরপর তা বিশাল একটি বাগানের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে; যাতে নানা ধরনের

ফলফলাদি রয়েছে। উক্ত সেচযন্ত্র তাতে প্রয়োজন অনুসারে পানি সরবরাহ করে। আর ঐ বাগানের সার্বিক দেখাশুনা, পরিচর্যা এবং যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্ম করার জন্য লোক আছে। ফলে সেখানে কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না এবং তার ফলও নষ্ট হয় না। অতঃপর ফল কাটার সময় তার মূল্য প্রত্যেকে উৎসের যা প্রয়োজন ও সমীচীন সে মোতাবেক বণ্টন করা হয়। সর্বদাই এভাবে বণ্টন করা হয়ে থাকে।

আপনি কি মনে করেন, এগুলো সব কোনো মালিক ও পরিচালক ছাড়াই হঠাৎ আপনা-আপনিই হয়েছে? বরং সেই

সেচ যন্ত্র ও বাগানের অস্তিত্ব এবং অন্যান্য যা কিছু আছে সব কিছু কোনো কর্তা ও পরিচালক ছাড়া হঠাৎ ঘটেছে? আপনি কি ভেবে দেখেছেন; এ ক্ষেত্রে আপনার বিবেক আপনাকে কী বলে, যদি আপনার বিবেক থাকে? সেটা আপনাকে কী জানান দিচ্ছে? সেটা আপনাকে কিসের দিশা দিচ্ছে?[১৫]

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য

সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর, এই বিশাল সৃষ্টিজগত ও সুন্দর সুন্দর নিদর্শনাবলি যে কারণে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন, তার কিছু হিকমত ও রহস্য উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি। যেমন-

১- মানুষের অধীনস্থ ও সেবায় নিয়োজিত করা:

মহান আল্লাহ যখন এই পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন, যারা সেখানে তাঁর ইবাদাত করবে এবং এ পৃথিবীকে আবাদ করবে, তখন তিনি তাদের জন্যই জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেন; যাতে এতে তাদের জীবন নির্বাহ যথাযথ পদ্ধতিতে হয় এবং তাদের ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কাজ কর্ম সঠিক হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ﴾ [الجاثية : ١٣]

“আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যা আছে আকাশে আর যা আছে যমীনে সেগুলোর সবকিছুকে।” [সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ১৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡهَٰرَ ٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ٣٣ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ٣٤﴾ [ابراهيم: ٣٢، ٣٤]

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি আকাশ হতে

পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতি

মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩২-৩৪]

২- আসমানসমূহ, যমীন ও জগতের সবকিছু আল্লাহ তা‘আলার প্রভুত্ব (রুবুবিয়্যাত) ও তাঁর এককত্বের ওপর সাক্ষী ও নিদর্শন:

আসমানসমূহ ও যমীন সহ সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাতের ওপর সাক্ষী এবং তাঁর এককত্বের ওপর নিদর্শন; কারণ, এই অস্তিত্বশীল বিশ্বে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, তাঁর রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করা এবং তাঁর এককত্বের ওপর বিশ্বাস আনা। আর বিষয়টি যেহেতু বড় তাই মহান আল্লাহ এর ওপর বৃহৎ সাক্ষী ও বড়

নিদর্শনকে পেশ করেছেন এবং অধিক জোরদার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহ ও যমীন সহ অস্তিত্বশীল সবকিছুকে এর সাক্ষী বানিয়েছেন। যার কারণে আল-কুরআনে অনেকবারই এসেছে, “তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরও হলো” এ কথাটি। যেমন নিম্নের আয়াতগুলোতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبۡتِغَآؤُكُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَسۡمَعُونَ ٢٣ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَيُحۡيِۦ بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٢٤ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ

وَٱلۡأَرۡضُ بِأَمۡرِهِۦۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمۡ دَعۡوَةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ إِذَآ
أَنتُمۡ تَخۡرُجُونَ ٢٥﴾ [الروم: ٢٢، ٢٥]

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শুনে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করান বিদ্যুৎ, ভয় ও আশার সঞ্চারকরূপে এবং

আসমান থেকে পানি নাযিল করেন অতঃপর তা দিয়ে যমীনকে পুনর্জীবিত করেন সেটোর মৃত্যুর পর; নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি থাকে; তারপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য একবার ডাকবেন তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২২-২৫]

৩- পুনরুত্থানের ওপর সাক্ষী বা প্রমাণস্বরূপ:

মানুষের জীবন দু'ভাগে বিভক্ত: দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন। আর আখেরাতের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٦٤﴾ [العنكبوت: ٦٤]

"আর এই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৪] কেননা, পরকাল হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জায়গা এবং সেখানে জান্নাতীরা জান্নাতে চির অধিবাসী হবে এবং

জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর আখিরাতের এই জীবনে মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়েই কেবল আসতে পারবে। তাই যারাই তার রবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে (অর্থাৎ নাস্তিক) এবং যাদের জন্মগত আকীদা ও বিবেক শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে তারাই পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করে। এ কারণেই আল্লাহ অগণিত দলীল-প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন; যাতে করে আখিরাত দিবসের প্রতি সবাই দৃঢ় বিশ্বাস আনে। কারণ, কোনো কিছু প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে তাকে পুনরায় করা অতি সহজ। বরং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করা

অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ ٢٧﴾ [الروم: ٢٧]

“আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি সেটো পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তাঁর জন্য অতি সহজ।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭] তিনি আরও বলেন,

﴿لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]

“মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবশ্যই অনেক বড় কাজ।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৫৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ ٢﴾ [الرعد: ٢]

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।”
[সূরা আর-রা‘দ, আয়াত:২]

অতএব, হে মানুষ:

আপনার কল্যাণ সাধনের জন্যই যখন এই পৃথিবীর সবকিছু অনুগত করা হয়েছে এবং তাঁর নিদর্শনাবলি ও দৃষ্টান্তবলিকে প্রামাণিক সাক্ষ্য হিসেবে আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তাহলে আপনি এই সাক্ষ্য প্রদান করুন যে;

“আল্লাহ ছাড়া সত্য আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই”।

আপনি যখন জানলেন যে, মৃত্যুর পর আপনার পুনরুত্থান ও জীবন লাভ করা আকাশ ও যমীন সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক সহজ এবং আপনার রবের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে, তিনি আপনার সকল কর্মের হিসাব নিবেন। আরও যখন জানতে পারলেন যে, এই সমগ্র জগত তার রবের ইবাদাত করছে। অতএব সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الجمعة: ١]

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

করছে আল্লাহর।” [সূরা আল-জুমু‘আহ, আয়াত: ১]

তাঁর বড়ত্বের কারণে সবকিছু তাঁকে সাজদাহ করে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٞ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ﴾ [الحج : ١٨]

“আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা সবাই আল্লাহকে সাজদাহ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, জীবজন্তু। আর সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে

অনেকে? আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১৮] বরং এই সৃষ্টি জগত যেমনটি তার জন্য উপযোগী হয় তেমনি করে তাঁর রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلطَّيۡرُ صَٰٓفَّٰتٖۖ كُلّٞ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسۡبِيحَهُۥۗ﴾ [النور: ٤١]

“আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা এবং উড্ডীয়মান পাখীসমূহ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তাঁর সালাত ও মহিমা

ঘোষণার পদ্ধতি জানে।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪১]

আর যখন আপনার সমস্ত শরীর আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম ও পরিচালনা অনুযায়ী নিজ গতিতে চলছে; যেমন অন্তর, দু’টি ফুসফুস, কলিজা এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর রবের আত্মসমর্পণকারী, যারা তাদের পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের রবের নিকট সমর্পণ করেছে। এমতাবস্থায় আপনি কি আপনার পছন্দ, যে পছন্দ শক্তির মাধ্যমে আপনার রবকে মেনে নেয়া কিংবা অস্বীকার করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, আপনি কি সে পছন্দকে আপনার রবের প্রতি

বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে, আপনার চারপাশের জগত, এমনকি আপনার শরীর যে কল্যাণময় ধারার দিকে চলছে, তার বিপরীতে পরিচালিত করবেন?

একজন পূর্ণ বিবেকবান মানুষ এই বিশাল জগতের চলার বিরোধিতা করে সবার থেকে ব্যতিক্রম হতে কখনই চাইতে পারে না।

মানব সৃষ্টি ও তার মর্যাদা

এই জগতে বসবাসের জন্য আল্লাহ তা‘আলা উপযুক্ত একটি জাতি সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই জাতি হলো মানুষ জাতি। আর আল্লাহর হিকমতের

দাবি তিনি মানুষকে যে ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করবেন তা হবে মাটি। তাই তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেন। তারপর তিনি এই সুন্দর আকৃতি দিয়ে তাকে গঠন করলেন, যে আকৃতিতে মানুষের জন্ম হয়। অতঃপর যখন তার আকৃতি পরিপূর্ণ হলো, তখন তিনি তাতে আত্মা দিলেন। ফলে যখন মানুষ সুন্দর আকৃতি পেয়ে শুনতে, দেখতে, নড়াচড়া করতে ও কথা বলতে আরম্ভ করল তখন তাঁর প্রভু তাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিলেন। আর তার যা জানা প্রয়োজন সব তাকে শিক্ষা দিলেন। জান্নাতের সবকিছু তার জন্য বৈধ করে দিলেন এবং পরীক্ষা করার জন্য একটি মাত্র গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ

করলেন। অনন্তর আল্লাহ তা‘আলা তার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করতে চাইলেন। তাই ফিরিশতাদের প্রতি তাকে সাজদাহ করার নির্দেশ দিলেন। সকল ফিরিশতা আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে সাজদাহ করল; কিন্তু একমাত্র ইবলিস অহংকার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে সাজদাহ করা হতে বিরত থাকল। আদেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং অহংকারের জন্য তিনি তাঁর রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন। এরপর ইবলিস আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত বৃদ্ধি করার জন্য প্রার্থনা করল। তিনি তার এই প্রার্থনা কবুল করে তার আয়ুকাল কিয়ামত পর্যন্ত

বৃদ্ধি করলনে। আদম ‘আলাইহসি সালাম ও তার বংশধরদরে মান-মর্যাদা দখেে ইবলসি-শয়তান হংিসায় ফটেে পড়ল এবং সে তার রবরে শপথ করল: সমস্ত বনী আদমকে সে পথভ্রষ্ট করব।ে তাই পথভ্রষ্ট করার জন্য সে তাদরে সামন,ে পছিন,ে ডান ে ও বাম ে সর্ব দকি থকেে তাদরেকে কুমন্ত্রণা দবিে বলে সদি্ধান্ত নলি।ে কবেল আল্লাহর একনষি্ঠ, সত্যবাদী ও মুত্তাকী বান্দাদরেকে সে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহসি সালামকে শয়তানরে চক্রান্তে পততি হতে নষিধে করছেলিনে। কনি্তু শয়তান আদম ‘আলাইহসি সালাম ও তার স্ত্রী

হাওয়্যাকে জান্নাত থেকে বতিাড়তি করার জন্য এবং তাদরে লজ্জাস্থান যা তাদরে পরস্পররে নকিট গ‌োপন রাখা হয়ছেলি তা প্রকাশ করার জন্য তার কুমন্ত্রণার জালে আবদ্ধ করল। সে তাদরে সামনে শপথ করে বলল: আমি ত‌োমাদরে শুভাকাঙ্খী। এই গাছরে ফল খলেে ত‌োমরা ফরিশিতা হয়ে যাবে অথবা চরিকাল জান্নাতী হয়ে যাব।ে মূলত এ কারণইে আল্লাহ ত‌োমাদরেকে ঐ গাছরে নকিটবর্তী হতে নষিধে করছেনে। ফলে মথি্যা কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে তারা আল্লাহর নষিদ্ধি গাছরে ফল খলেনে। তাই নরি্দশে অমান্য করার কারণে প্রথম শাস্তি হসিবেে তারা বস্ত্রহীন হয়ে পড়লনে।

শয়তানরে কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক করার ব্যাপারটি তিনি তাদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। আদম ‘আলাইহিস সালাম তার ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তাওবা করলে তিনি তার তাওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তিনি তাকে মনোনীত করেন ও হিদায়াত দান করেন। আর দ্বিতীয় শাস্তি হিসেবে তিনি তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দিলেন। কেননা এটাই তার বাসস্থান। এখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত করতে হবে। আর তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, এ মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এখানে জীবন-যাপন করবে,

এখানেই মারা যাবে, অবশেষে কিয়ামত দিবসে এই যমীন থেকেই পুনরায় উঠানো হবে।

অতঃপর আদম 'আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রী হাওয়া আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন এবং বসবাস শুরু করলেন। তাদের বংশ বিস্তার হলো। তারা সবাই আল্লাহর নির্দেশে অনুসারে তাঁর ইবাদাত করতেন। আর আদম 'আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর নবী।

আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ١١
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ
خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ ١٢ قَالَ فَٱهۡبِطۡ
مِنۡهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجۡ إِنَّكَ مِنَ
ٱلصَّٰغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ١٤
قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي
لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ
بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ
وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ١٧ قَالَ ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا
مَذۡءُومٗا مَّدۡحُورٗاۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنكُمۡ أَجۡمَعِينَ ١٨ وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ
فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩ فَوَسۡوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيۡطَٰنُ لِيُبۡدِيَ لَهُمَا
مَا وُۥرِيَ عَنۡهُمَا مِن سَوۡءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا
رَبُّكُمَا عَنۡ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيۡنِ أَوۡ
تَكُونَا مِنَ ٱلۡخَٰلِدِينَ ٢٠ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ
ٱلنَّٰصِحِينَ ٢١ فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٖۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ

بَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن
وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمۡ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا
ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٢
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣ قَالَ ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ
لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ
حِينٖ ٢٤ قَالَ فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا
تُخۡرَجُونَ ٢٥﴾ [الاعراف: ١١، ٢٥]

“‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমরা তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছি, তারপর আমরা ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সাজদা কর। অতঃপর ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল। সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। তিনি বললেন, ‘আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম

তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সাজদাহ করলে না?’ সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।’ সে বলল, ‘আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।’ সে বলল, ‘আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই

আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব। তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।’ তিনি বললেন, ‘এখান থেকে বের হয়ে যাও ধিকৃত, বিতাড়িত অবস্থায়। মানুষের মধ্যে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।’ আর হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করুন, অতঃপর যেথা হতে ইচ্ছা খান, কিন্তু এ গাছের ধারে-কাছেও যাবেন না, তাহলে আপনারা যালিমদের

অন্তর্ভুক্ত হবনে।’ তারপর তাদরে লজ্জাস্থান, যা তাদরে কাছে গোপন রাখা হয়ছেলি তা তাদরে কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদরেকে কুমন্ত্রণা দলি এবং বলল, ‘পাছে তোমরা উভয়ে ফরিশিতা হয়ে যাও কংিবা তোমরা স্থায়ীদরে অন্তর্ভুক্ত হও, এ জন্যইে তোমাদরে রব এ গাছ থকেে তোমাদরেকে নষিধে করছেনে।’ আর সে তাদরে উভয়রে কাছে শপথ করে বলল, ‘নশি্চয় আমি তোমাদরে শুভাকাংখীদরে একজন।’ অতঃপর সে তাদরেকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপততি করল। এরপর যখন তারা সে গাছরে ফল খলে, তখন তাদরে লজ্জাস্থান তাদরে কাছে প্রকাশ হয়ে

পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?’ তারা বলল, ‘হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং যমীনে কিছুদিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।’ তিনি বললেন, ‘সেখানেই

তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে’।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১১-২৫]

আপনি যখন আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির এই মহান বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন, তখন দেখতে পাবেন; আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মর্যাদার যাবতীয় সম্মানসূচক পরিচ্ছদগুলো তাকে দান করেছেন। যেমন, বিবেক শক্তি, জ্ঞান, প্রকাশ করার শক্তি, কথা বলার শক্তি, সুন্দর গঠন ও আকৃতি, মাঝারী শরীর, যুক্তি ও বিবেচনা শক্তি দিয়ে

জ্ঞানার্জনের দক্ষতা এবং উত্তম চরিত্র যেমন- সততা, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। সুতরাং সে যখন মায়ের গর্ভের মধ্যে এক বিন্দু তুচ্ছ পানি ছিল তার সেই অবস্থার মাঝে এবং সে যখন পরিপূর্ণ সুন্দর আকৃতির মানুষ হয়ে সৎ আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী ‘আদন’ জান্নাতের অধিবাসী হবে আর তার নিকট ফিরিশিতা প্রবেশ করবে, তার ঐ অবস্থার মাঝে কতই না তফাৎ! তাই তো তিনি বলেন,

﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤﴾ [المؤمنون : ١٤]

“অতএব (দেখে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১৪]

সুতরাং, পৃথিবীটা একটি গ্রামের মতো, আর মানুষ তার অধিবাসী। সবকিছু তার কাজে ব্যস্ত। তার যাবতীয় কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের খিদমত ও প্রয়োজনের জন্যই এসব কিছু তৈরি করা হয়েছে। তাই তার হিফাযতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ দিন-রাত তার হিফাযতের কাজ করে যাচ্ছে। বৃষ্টি ও উদ্ভিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ তার রিযিকের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও কাজ করে যাচ্ছে। কক্ষপথসমূহকে

অনুগত করা হয়েছে, তারা তার কল্যাণে চলমান। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে অনুগত ও চলমান রাখা হয়েছে তার সময়ের হিসাবের জন্য এবং তার সার্বিক জীবনের স্থিতিশীলতা ঠিক রাখার জন্য। উপর আকাশের ভাসমান জগত যেমন বাতাস, মেঘমালা, পাখী ইত্যাদি সহ তাতে যা কিছু আছে সবই তার অনুগত। নিচের সমস্ত জগতও তার অনুগত, তার কল্যাণ সাধনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন- যমীন, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, গাছপালা, ফলমূল, তৃণলতা, জীব-জন্তু ইত্যাদি আরও যা কিছু আছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ مِنَ
ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ
وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦۖ وَسَخَّرَ
لَكُمُ ٱلۡأَنۡهَٰرَ ٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ
وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ٣٣ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا
سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ
ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ٣٤﴾ [ابراهيم: ٣٢، ٣٤]

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। আর

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩২-৩৪][১৬]

মহান আল্লাহ যে মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দান করেছেন তার অন্যতম প্রমাণ হলো, তিনি পার্থিব জীবনে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

এবং পরকালে উচ্চ আসনে তাকে পৌঁছে দেবে এমন প্রয়োজনীয় মাধ্যমও দান করেছেন; ফলে তিনি তার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেন, অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠান, যারা আল্লাহর বিধি-বিধান বর্ণনা করেন এবং তাঁর দিকে আহ্বান করেন।

তারপর আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামের জন্য তার সত্তা থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। এর ফলে তিনি তার নিকট আরাম, প্রশান্তি, স্থিরতা অনুভব করলেন। তিনি শুধু একা নন; বরং এমন মিলিনে তারা উভয়েই পরস্পরের মাঝে

প্রশান্তি, তৃপ্তি, ভালোবাসা, ও
অনুকম্পা অনুভব করলেন। কেননা
উভয়ের শারীরিক, আত্মিক ও
স্নায়ুবিক সেতু বন্ধনের মাঝে এক
ধরনের সাড়া পরিলক্ষিত হয় এবং
একজনের অনুপস্থিতি অন্যজনের
মধ্যে খেয়াল করা যায়। তাদের
ভালোবাসা ও ঐক্য শুধুমাত্র একটি
নতুন প্রজন্ম গঠনের জন্য। এই
সমস্ত আবেগ, অনুভূতি তাদের দু’টি
আত্মাকে একত্রিত করেছে এবং ঐ
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই অনুভূতিগুলো
আত্মা ও স্নায়ুর জন্য প্রশান্তি, শরীর
ও অন্তরের জন্য আরামদায়ক, জীবন
ও জীবিকার স্থিরতা এবং রূহ ও
অন্তরসমূহের মিলনস্বরূপ। এক কথায়

পুরুষ ও নারীর সমানভাবে প্রশান্তির জন্য।

আল্লাহ তা‘আলা মানব সন্তানের মধ্য থেকে মুমিন বান্দাদেরকে বাছাই করে তার বন্ধু বানিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যে তাদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। তারা তার বিধি মোতাবেক কাজ করে থাকেন। যাতে করে তারা জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে পারেন। আর তাদের মধ্য থেকেই নবী, রাসূল, ওলী ও শহীদগণকে চয়ন করে তাদেরকে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নি‘আমত দান করেন, যা দ্বারা জীবন সুখকর হয়। আর তা হলো আল্লাহর ইবাদাত, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর সঙ্গে

গোপনে কথা বলার সুযোগ অর্থাৎ মোনাজাত। এ ছাড়া আরও অনেক নি'আমত দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেছেন, যেগুলো অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। যেমন- নিরাপত্তা, প্রশান্তি লাভ ও সফলতা ইত্যাদি। বরং এসবের চেয়ে বড় নি'আমত হলো, তারা সে সত্যকে জানতে পেরেছেন যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন, তারা সে সত্যের ওপর ঈমান এনেছেন। আর তিনিও তাঁর প্রতি তাদের ঈমান (বিশ্বাস স্থাপন) ও একনিষ্ঠতার পুরস্কারস্বরূপ আখেরাতে তাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছেন জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ এবং আল্লাহর দয়ার মানানসই মহাসাফল্য।

নারীর মর্যাদা

নারীরা ইসলামে যে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, পৃথিবীর পূর্ববর্তী কোনো জাতি-গোষ্ঠীর নিকট তারা তা অর্জন করতে পারেনি। আর না পরবর্তী কোনো জাতি সেটা বুঝতে পারবে। কারণ, ইসলাম মানুষকে যে মর্যাদা দান করেছে তাতে নারী-পুরুষ তথা উভয়েই সমানভাবে শরীক। এই দুনিয়ায় তারা উভয়েই আল্লাহর বিধানের সামনে সমান, তেমনিভাবে আখেরাতেও তারা তাঁর সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الاسراء: ٧٠]

“আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]

তিনি আরও বলেন,

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ [النساء : ٧]

“পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ٢٢٨﴾ [البقرة: ٢٢٨]

“আর নারীদের ওপর তাদের (পুরুষদের) যেরূপ অধিকার আছে, নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

“আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

“আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, ‘হে

আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন’।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ ١٩٥﴾ [آل عمران: ١٩٥]

“সুতরাং তাদের রব তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের পুরুষ বা নারীর মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমলকে নষ্ট করব না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤﴾ [النساء : ١٢٤]

“আর মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে, ঐ সমস্ত

লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা সামান্য পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৪]

নারীরা ইসলামে যে মর্যাদা অর্জন করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম, জাতি বা আইনশাস্ত্রে তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যেমন, রোমান সভ্যতায় বলা হয়েছে যে, নারী হলো পুরুষের ক্রীতদাস ও অনুগত। কোনো কিছুতেই তার কোনো অধিকার নেই।

খ্রিষ্টানদের বিখ্যাত রোম সম্মেলনে নারীর অধিকার নিয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, নারী এমন এক সৃষ্টি যার কোনো আত্মা নেই। আর সে এ

কারণে অন্য মানুষের উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না। সে হলো একটি অপবিত্র জাতি।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। সে ছিল ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য এবং তাকে শয়তানী কাজের অপবিত্র বস্তু বিবেচনা করা হতো।

ভারতের প্রাচীন ধর্ম নীতিগুলোতে এ সিদ্ধান্ত ছিল যে, নারীর চেয়ে প্লেগ-রোগ, মৃত্যু, জাহান্নাম, সাপের বিষ, ও আগুন উত্তম। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থিব জীবনে স্ত্রীর অধিকার শেষ হয়ে যেত। নারী যখন তার স্বামীর মৃত দেহ পুড়তে দেখত তখন

(বাধ্যতামূলকভাবে) সেই আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করত। কারণ, এমনটি না করলে তাকে অভিশাপ করা হতো।

ইয়াহূদী ধর্মে নারীর বিধান

ইয়াহূদী ধর্মে নারীর বিধান সম্পর্কে যা বর্ণনা এসেছে তা নিম্নরূপ:

আমি মন-প্রাণকে প্রদক্ষিণ করালাম, জানতে ও গবেষণা করতে এবং হিকমত ও আকল অনুসন্ধানের জন্য এবং জানতে চাইলাম, অনিষ্টতা কী? বস্তুত সেটা হচ্ছে মূর্খতা, আরও জানতে চাইলাম নির্বুদ্ধিতা কী? বস্তুত তা পাগলামি; ফলে আমি মৃত্যুর চেয়েও তিক্ত একটি বিষয় খুঁজে পেলোম, আর

তা হচ্ছে: নারী। সে তো এক ইন্দ্রজাল, তার অন্তর হলো ফাঁদ, আর তার হাত দু’টি হচ্ছে বন্দিত্বের কড়া।[১৭]

এতো হলো প্রাচীনকালের নারীর কথা। পক্ষান্তরে মধ্যযুগীয় ও বর্তমানে নারীর অবস্থা কেমন তা নিম্নে বর্ণিত কিছু ঘটনায় পরিষ্কার হয়।

ডেনমার্কের লেখক উয়েথ কোর্ডস্টেন নারীর প্রতি ক্যাথলিক গির্জার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: (ক্যাথলিক মতাদর্শের দৃষ্টি অনুসারে মধ্যযুগে ইউরোপীয় নারীদের মূল্যায়ন ছিল অতি নগণ্য। তারা নারীদেরকে

দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি-জীব মনে করতো।)

ফ্রান্সে ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি সম্মেলন হয়, সেখানে নারীর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন উঠে নারী কি মানুষের অন্তর্ভুক্ত কিনা? অবশেষে অনেক বিতর্কের পর উপস্থিত সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নারী মানুষের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পুরুষের সেবার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফ্রান্সের আইন শাস্ত্রের ২১৭ নং ধারাতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

চুক্তি করার সময় সশরীরে স্বামীর অংশগ্রহণ অথবা তার লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিবাহিত নারীর তার নিজের সম্পদ দান করা, মালিকানা পরিবর্তন করা, বন্ধক রাখা, কোনো কিছুর বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়া কোনো সম্পদের মালিক হওয়া বৈধ নয়; যদিও তার বিয়ের সময় স্বামী ও স্ত্রীর সম্পত্তি পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকার কথা বলা হোক না কেন।

আর ইংল্যান্ডে অষ্টম হ্যানরী ইংরেজ নারীদের ওপর বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করেছিল। তাছাড়া ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নারীরা ছিল দেশের নাগরিকদের গণনার বাইরে এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ

পর্যন্ত নারীদের ব্যক্তিগত কোনো অধিকারও ছিল না।[১৮]

আর আধুনিক যুগে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নারীদেরকে তো ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে গেছে সে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ব্যবসায়িক প্রচার অভিযানে নারীদেরকে উলঙ্গ করে তার ওপর পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। পুরুষরা আইন ও সিদ্ধান্ত দিয়ে তার দেহ ও ইজ্জত বৈধ করা হয়েছে, যাতে করে নারী তাদের জন্য সর্বত্র বিনোদনের বস্তু হয়।

বর্তমানে নারীর মূল্যায়ন ততদিন পর্যন্ত অটুট থাকে যতদিন সে নিজ হাতে উপার্জন করতে পারে এবং চিন্তা ও শরীর দিয়ে সমাজে অবদান রাখতে পারে। তারপর যখন সে বৃদ্ধা হয় এবং দান করার সকল উপকরণ হারিয়ে ফেলে তখন সমাজের সকল মানুষ এবং সকল প্রতিষ্ঠান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর সে তার বাড়িতে অথবা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে একাকী জীবন-যাপন করে।

উপরের এগুলোর সাথে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যা এসেছে তার মাঝে তুলনা করে দেখুন নারীকে ইসলাম কত বড় মর্যাদা দান করেছে! (আল্লাহু

আকবার), কখনো এক রকম নয়। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ٧﴾ [التوبة: ٧١]

“আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ٢٢٨﴾ [البقرة: ٢٢٨]

“আর নারীদের ওপর তাদের যেরূপ অধিকার আছে, নারীদেরও অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।” [সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২২৮]

তিনি আরও ঘোষণা করেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

“আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার

পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, ‘হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন’।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

নারীকে আল্লাহ তা‘আলা যখন এমন সম্মান দান করেন তখন তিনি সকল মানুষকে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাকে মা, স্ত্রী, মেয়ে এবং বোন করে সৃষ্টি করেছেন। যার কারণে তিনি শুধুমাত্র নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বিশেষ কিছু বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন, যেখানে পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মানব সৃষ্টির হিকমত

মানুষ সৃষ্টির পিছনে মহান আল্লাহর এমন সব হিকমত কাজ করছে যা জানতে বিবেকসমূহ অপারগ হয়ে গেছে। যা বর্ণনা করতে মানুষের ভাষা অসমর্থ হয়ে গেছে। তবে আমরা এখানে বিশে কিছু বিশেষ অবস্থান উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে এ সৃষ্টিরহস্যের কিছু ধারণা পেশ করা যাবে; যেমন,

১- মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে যেমন- ক্ষমাশীল, দয়াবান, মার্জনাকারী, সহিষ্ণু ইত্যাদি। এ সকল নামের প্রভাব প্রকাশ হওয়া একান্ত জরুরী। অতএব, আল্লাহর হিকমত চায় যে, আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সন্তানরা এমন এক আবাসস্থলে

অবতরণ করুক, যেখানে তাদের মাঝে আল্লাহর সুন্দর নামের প্রভাবসমূহ প্রকাশ পাবে। ফলে তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা তিনি দয়া করবেন, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সহিষ্ণু হবেন। এভাবে তিনি চাইলেন তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রভাব প্রকাশ করবেন।

২- মহান আল্লাহ, তিনি হচ্ছেন স্পষ্ট মহাসত্য অধিপতি বা সম্রাট। আর মহাঅধিপতি তো তিনিই, যিনি আদেশ দেন, নিষেধ করেন, সাওয়াব দেন, শাস্তি দেন, অপমানিত করেন, সম্মানিত করেন, মর্যাদা দেন এবং লাঞ্ছিত করেন। সুতরাং তাঁর মহান আধিপত্য

চয়েছে আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তার সন্তানদেরকে এমন এক আবাসস্থলে অবতরণ করাতে, যেখানে তাদের ওপর তাঁর হুকুম-আহকাম চলবে। অতঃপর তিনি তাদেরকে এমন এক আবাসস্থলে স্থানান্তরিত করবেন, যেখানে তাদের স্বীয় কর্মের প্রতিদান সম্পন্ন হবে।

৩- আল্লাহ তা‘আলা চেয়েছেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এমন কিছু নবী, রাসূল, ওলী ও শহীদ বানাতে, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তাই তিনি তাদেরকে তাদের ও তাদের শত্রুদের মাঝে ছেড়ে দেন এবং শত্রুদের মাধ্যমে তাদেরকে

পরীক্ষা করেন। ফলে যখন দেখা যাবে যে, তারা মহান আল্লাহকেই প্রাধান্য দিবে এবং তাদের জীবন ও যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি ও ভালোবাসায় ব্যয় করবে, তখন তারা তাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ করতে পারবে; যা মূলত এছাড়া অন্য কোনো ভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। বস্তুত রিসালাত, নবুওয়াত এবং শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহর নিকট একটি শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা। আর আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তার সন্তানদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার যে ফয়সালা তিনি দিয়েছেন তা ব্যতীত এ মর্যাদাপূর্ণ জিনিস অর্জন আর কোনো কিছু দ্বারা হতো না।

৪– আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সন্তানদেরকে এমন এক ফরমুলায় সৃষ্টি করেছেন, যা ভালো ও মন্দ গ্রহণের উপযুক্ত, যাতে রয়েছে প্রবৃত্তি ও ফিতনার প্রতি আহ্বান, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রতি সাড়া দান করার প্রবণতা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি দু’টিই সৃষ্টি করেছেন, সাথে সাথে এ দু’টিকে করেছেন আহ্বানকারীরূপে; যাতে করে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হয়। আর তাঁর বান্দাদের মাঝে তাঁর ইয্যত-সম্মান প্রকাশ করবেন হিকমত ও দাপটের ক্ষেত্রে, রহমত প্রকাশ করবেন, দয়া প্রদর্শন করাবেন, করুনা দেখাবেন তাঁর কর্তৃত্ব

ও সার্বভৌমত্বে। অতএব, তাঁর হিকমত চায় যে, তিনি আদম ও তাঁর সন্তানদেরকে পৃথিবীতে অবতরণ করান; যাতে করে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। আর মানুষের মধ্যে থাকা এসব আহ্বানের প্রতি সাড়াদান ও গ্রহণ করার প্রস্তুতির প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যায়, আর সেটা অনুযায়ী তিনি তাদেরে সম্মান ও অসম্মান এর নির্ধারণ করেন।

৫- মহান আল্লাহ জগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য, আর এটাই হচ্ছে তাদেরকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি জিন্ন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬] আর জানা কথা যে, সৃষ্টির কাছ থেকে যে দাসত্ব তিনি চান তা স্থায়ী নিয়ামতভূমি ও চিরস্থায়ী আবাসভূমিতে অবস্থান করে করা কখনো সম্ভব নয়। এটা তো শুধু অর্জিত হতে পারে কেবল অস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদাপদের আবাসস্থলে। চিরস্থায়ী আবাসস্থল তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ উপভোগের স্থান, পরীক্ষা ও কষ্টের

নবিাস নয়। [তাই তাদরেকে দুনয়িাতে অবতরণ করানো হয়ছে]

৬- গায়বে বা অদৃশ্যরে প্রতি ঈমান আনয়ন করাই তো কল্যাণকর বশি্বাস। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ জনিসিরে প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তা তো প্রত্যকে ব্যক্তিই কয়িামতরে দনি করবে। অতএব, মানুষদরেকে যদি সুখ ও আরামরে আবাসস্থল জান্নাতইে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে তারা গায়বে বা অদৃশ্যরে প্রতি ঈমান স্থাপন করার মর্যাদা লাভ করতো না, যার পরে আসবে আনন্দ ও সম্মান, যা অর্জতি হবে অদৃশ্যরে প্রতি ঈমান রাখার কারণে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা

তাদেরকে এমন এক আবাসস্থলে অবতরণ করান, যেখানে অদৃশ্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপনের অবকাশ থাকে।

৭- আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র যমীন থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়ে আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন। আর যমীনের মধ্যে ভালো ও মন্দ, বিষণ্ণতা ও কোমলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি জানেন যে, আদম সন্তানের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা তাঁর আবাসস্থলের (জান্নাতের) বাসিন্দা হওয়ার উপযুক্ত নয়। অতএব, তিনি তাকে এমন আবাসস্থলে অবতরণ করান, যেখানে ভালো ও মন্দ উভয়ই বের করে ছাড়েন।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে দু’টি আবাসস্থলে পৃথক পৃথক করে দেন। সুতরাং ভালো লোকদেরকে তিনি তাঁর আবাসস্থল ও নৈকট্যের অধিবাসী করেন। আর খারাপ লোকদেরকে দুঃখ ও কষ্টের নিবাস অর্থাৎ দুষ্টদের আবাসস্থলের অধিবাসী করেন।

৮- মহান আল্লাহ আদম সন্তানদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠানোর মাধ্যমে এটা চেয়েছেন যে, তিনি তাঁর স্বীয় বান্দাদের, যাদের ওপর তিনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের ওপর তিনি যে নি‘আমত দান করেছেন সেটার পূর্ণতা জানাতে এবং সেটার মর্যাদা বুঝাতে। যাতে করে তারা সবচেয়ে বড় ভালোবাসা ও শোকর

আদায়কারীতে পরিণত হয় আর যে নি'আমত তিনি তাদেরকে দান করেছেন সেটার স্বাদ বিশদভাবে উপভোগকারী হয়। তাই তিনি তাঁর শত্রুদের সাথে কিরূপ আচরণ করেন এবং তাদের জন্য কী শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তাদেরকে দেখান এবং নির্দিষ্ট করে তিনি তাদেরকে যে সর্বোচ্চ নি'আমত দান করেন তা প্রত্যক্ষ করান। যাতে করে তাদের খুশি বেড়ে যায়, অন্যের ন্যায় সুখ কামনা পুরা হয় এবং আনন্দ বৃহৎ হয়। আর এটা তাদের প্রতি পূর্ণাঙ্গ নি'আমত ও ভালোবাসার একটি অংশ। এ জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করানো, পরীক্ষায় নিপতিত করা ও নিরীক্ষা সম্পন্ন করার কোনো

বিকল্প ছিল না; আর তাদের মধ্যকার যাকে ইচ্ছা তৌফিক প্রদান করা তাঁরই একান্ত রহমত ও অনুগ্রহ এবং যাকে ইচ্ছা ব্যর্থ করা তাঁরই হিকমত ও ইনসাফের দাবী অনুযায়ী, আর তিনি তো সর্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।

৯- আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন, আদম 'আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানেরা সুন্দরতম অবস্থায় জান্নাতে ফিরে আসুক। তাই তিনি তাদেরকে এর পূর্বেই দুনিয়ার কষ্ট, এবং তার দুঃখ ও বেদনার স্বাদ উপভোগ করান। আর তাদেরকে ঐসব জিনিসের আদেশ দেন যার মাধ্যমে পরকালের আবাসস্থল জান্নাতে প্রবেশ করার মর্যাদা তাদের

নিকট বড় হবে, কারণ বিপরীতের সৌন্দর্য বিপরীত জিনিস দ্বারাই প্রকাশ পায়।[১৯]

মানুষ সৃষ্টির সূচনা বিশ্লেষণ করার পর ভালো মনে করছি যে, তাদের সঠিক দীনের চাহিদা আলোচনা করব।

মানুষের জন্য দীন-ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবনে দীনের প্রয়োজন তাদের জীবনে অন্যান্য জরুরী জিনিসের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, মানুষের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রেগুলো জানা অনিবার্য, তাছাড়া তার চালচলন এমন

হওয়া উচিৎ যা তার মঙ্গল বয়ে আনবে ও তার অনিষ্টতাকে দূর করবে। আর (আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান) শরী‘আতই যা উপকার করে এবং যা ক্ষতি করে ঐ সব কর্মের মাঝে পার্থক্য করে দিতে পারে। বস্তুত শরী‘আত হচ্ছে সৃষ্টি-জীবের মাঝে আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ নীতি আর তাঁর বান্দাদের মাঝে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সুতরাং কোনো মানুষের জন্যই এমন শরী‘আত ছাড়া জীবন-যাপন সম্ভব নয়, যে শরী‘আত তারা কী করবে এবং কী বর্জন করবে তা পার্থক্য করে দিবে।

মানুষরে যহেতেু ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়ছে,ে সুতরাং তার জানা আবশ্যক য,ে স েযা ইচ্ছা কর েতা ক িতার জন্য কল্যাণকর নাক িক্ষতকির? তা তাক েসংশ োধন করব,ে না নষ্ট করব?ে এগুল োর কছিু কছিু মানুষ কখন ো কখন ো তাদরে জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতরি মাধ্যম েজানত েপার।ে আবার কছিু কছিু মানুষ তাদরে ববিকে দ্বারা প্রমাণ গ্রহণরে মাধ্যম েজানত েপার।ে আবার কছিু কছিু মানুষ রাসূলগণরে মাধ্যম েসগেুল োর পরচিতি িদান, তাদরে আল োচনা এবং তাদরে সৎপথ প্রদর্শনরে মাধ্যম েজানত েপার।ে[২০]

ফলে নাস্তিক্য বস্তুবাদী মতাদর্শগুলো যতই মাতামাতি করুক, যতই আকর্ষণীয় করে নিজেদের পেশ করুক আর এসব চিন্তা-চেতনা সংখ্যার দিক থেকে যত বেশিই হোক না কেন, তা কখনও ব্যক্তি ও সমাজকে সত্য দীন (ধর্ম) থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সেগুলো শরীর ও আত্মার চাহিদাগুলো পূরণে সক্ষম নয়। বরং যখনই কোনো ব্যক্তি এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখনই সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, এগুলো তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না আর তার পিপাসাও মিটাতে পারবে না। এটাও বুঝতে সক্ষম হবে যে, সঠিক দীন ছাড়া

এ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ারও কোনো পথ নেই। জ্ঞানী আরনেস্ট রেনান বলেন: ‘প্রত্যেক বস্তু যা আমরা পছন্দ করি তা বিলুপ্ত হওয়া এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিল্পের ব্যবহারের উপযুক্ততা বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, কিন্তু দীনের প্রয়োজনীয়তা কখনও বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। বরং তা সে সব বস্তুবাদী মতাদর্শকে বাতিল করার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে টিকে থাকবে, যে ভ্রান্ত মতাদর্শগুলো চায় মানুষদেরকে পার্থিব জীবনে সংকীর্ণতার সীমাবদ্ধ করে রাখতে।’[২১]

মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজদী বলেন:
‘দীনদারী বা দীনের প্রয়োজনীয়তার চিন্তাধারা বিলীন হয়ে যাবে এটা অসম্ভব। কারণ তা মনের ঝোঁকগুলোকে বৃদ্ধি করে এবং তার অনুভূতিকে সম্মানিত করে। এমন চমৎকার আকর্ষণ যা মানুষের শিরকে উঁচু করে। বরং এই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি তার জ্ঞানের দ্বারা সুন্দর ও খারাপকে বুঝতে পারবে ততক্ষণ ধর্ম পালনের অভ্যাসের সাথে মানুষ যুক্ত হবেই। এক্ষেত্রে তার অনুভূতির অগ্রগতি এবং জ্ঞানের বিকাশ

অনুপাতে এই স্বাভাবিক প্রকৃতি বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।’[২২]

সুতরাং মানুষ যখন তার রব থেকে দূরে সরে যায় তখন সে তার অনুভূতির অগ্রগতি ও জ্ঞানের সুদূর পরিধি অনুযায়ী বুঝতে পারে যে, তার রব সম্পর্কে ও তার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ, আরও বুঝতে পারে সে তার স্বীয় আত্মা সম্পর্কে কত অজ্ঞ, কী তার উপকার করে ও কী অপকার করে, কী তাকে সুখী করে ও কী তাকে দুঃখী করে সেটা সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ। আরও বুঝতে পারে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও তার পরিভাষা সম্পর্কে

যেমন- জ্যোতির্বিজ্ঞান,
অনুবিজ্ঞান, পরমাণু বিজ্ঞান ইত্যাদি
সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ। .... আর
এমতাবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তি
আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহমিকা ছেড়ে দিয়ে
বিনয়-নম্রতা ও আত্মসমর্পণের দিকে
প্রত্যাবর্তন করে এবং তার মনে দৃঢ়
বিশ্বাস জন্মে যে, প্রত্যেক জ্ঞান-
বিজ্ঞানের অন্তরালে একজন
প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী রয়েছেন, প্রত্যেক
পদার্থের পিছনে একজন মহা শক্তিমান
স্রষ্টা আছেন। আর এ বাস্তবতাই
সত্য ও ন্যায় অন্বেষণকারীকে গায়েবে
বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনতে, সত্য
দীনের আনুগত্য করতে এবং জন্মগত
ফিতরাতের ডাকের প্রতি সাড়া দিতে

বাধ্য করে। আর মানুষ যখন এই বাস্তবতা থেকে সরে যায় তখনই তার জন্মগত ফিতরাত উল্টে যায় এবং সে বোবা ও নির্বাক জীব-জন্তুর পর্যায়ে চলে যায়।

এ পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি টানবো এ কথার মাধ্যমে যে, নিশ্চয় সঠিক দীনদারি, যা শুধুমাত্র আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ এবং তিনি যে পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদাত করার বিধান প্রণয়ন করেছেন সে মোতাবেক ইবাদাত করার ওপর নির্ভর করে, তা জীবনের জন্য এক জরুরী অনুষঙ্গ। যাতে করে মানুষ এর ভিত্তিতে তার যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীকে

বিশ্বজাহানের রব মহান আল্লাহর জন্য বাস্তবায়ন করতে পারে এবং যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ধ্বংস, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য, কল্যাণ ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে। মানুষের চিন্তাশক্তি পূর্ণতার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী। ফলে এর দ্বারাই (মানুষের) বিবেক তার তীব্র চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এটা ব্যতীত সে তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে কোনোভাবেই বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

এটি আত্মার পবিত্রকরণ ও অনুভূতি শক্তির সংশোধনের জন্য এক আবশ্যকীয় মূল জিনিস। কারণ, উন্নত

আবেগ-অনুভূতি দীনের মধ্যেই খুজে পায় তার ব্যাপক ক্ষেত্রের, অবগাহনের স্থান, যার উৎস নিঃশেষ হবে না, সেখানে সে তার জীবনের উদ্দেশ্য খুজে পায়।

এটি ইচ্ছা শক্তিকে পূর্ণ করার জন্য এক প্রয়োজনীয় মূল উপাদান। কারণ তা তাকে বিভিন্ন মহত্তর চাহিদা ও চালিকাশক্তি দ্বারা সহায়তা করে এবং হতাশা ও নৈরাশ্যের জগতে তাকে প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় বর্ম দিয়ে রক্ষা করে। এর পরেও কেউ যদি বলে: “মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব”, তাহলে আমরাও বলব যে, “মানুষ স্বভাবতই দীনদার বা ধার্মিক।”[২৩]

কারণ মানুষের মাঝে দু’টি শক্তি রয়েছে:

- চিন্তা জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তি এবং
- ইচ্ছা জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তি।

আর মানুষের জীবনের পূর্ণ সফলতা ও সার্থকতা নির্ভর করছে উপরোক্ত দুটি (চিন্তা) জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তি ও ইচ্ছা জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তির পরিপূর্ণতার ওপরই।

আর নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত (চিন্তা) জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তির পূর্ণাঙ্গতাও বাস্তবায়ন হবে না। যথা-

১। স্রষ্টা, রিযিকদাতা, যিনি মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন এবং তাকে অসংখ্য নি‘আমত দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সে মা‘বুদ আল্লাহ সম্পর্কে জানা।

২। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা। আর তাঁর জন্য কী করা অপরিহার্য এবং তাঁর বান্দাদের ওপর এ সমস্ত নামের প্রভাব সম্পর্কে জানা।

৩। এমন পথ সম্পর্কে জানা, যে পথ তাকে তার রব মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবে।

৪। এমন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদ সম্পর্কে জানা, যা মানুষের মাঝে এবং এই পথকে জানার মাঝে বাধা হয় এবং যা তাকে মহা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছিয়ে দেয়ার মাঝে বাধা দেয়।

৫। আপন নফস বা সত্তা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা এবং তার কী প্রয়োজন, কী তাকে পরিশুদ্ধ করবে, কী তাকে কলুষিত করবে, এবং তার মধ্যে কী সুন্দর বৈশিষ্ট্য ও অসুন্দর দোষ-ত্রুটির সমাহার রয়েছে তা জানবে।

সুতরাং এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই মানুষ তার জ্ঞান-বিষয়ক শক্তিকে পরিপূর্ণ করতে পারে।

আর মানুষের ওপর আল্লাহর যে সকল অধিকার রয়েছে সেগুলোর যথাযথ খেয়াল রাখা, তা নিষ্ঠা, সততা, ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতার সাথে সঠিকভাবে তা পালন না করা ব্যতীত জ্ঞান ও ইচ্ছা-বিষয়ক শক্তির পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে না। আর তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই দুই শক্তিকে পরিপূর্ণ করার কোনো পথও নেই। সুতরাং সে ঐ সিরাতে মুস্তাকীম বা সঠিক পথে পরিচালিত হতে বাধ্য, যে সঠিক পথের হিদায়াত তিনি তাঁর ওলি-আউলিয়া বা বন্ধু ও প্রিয় লোকদেরকে প্রদান করেছেন।[২৪]

আমরা যখন জানতে পারলাম যে, সঠিক দীন হলো, আত্মার বিভিন্নমুখী ক্ষমতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য। (আল্লাহর সাহায্য না হলে আত্মা সঠিক দীন পেতো না), তাহলে আরও জেনে রাখুন! নিশ্চয় দীন সমাজ রক্ষাকারী বর্মও বটে। কারণ মানবজীবন তার অন্যান্য নাগরিকের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর এমন একটি নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া এই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও সম্পূর্ণ হবে না, যা তাদের সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল করবে, তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, তাদের অধিকারসমূহের জিম্মাদার হবে। এই

নিয়ম-পদ্ধতির জন্য এমন এক শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর বাদশাহের প্রয়োজন, যিনি আত্মাকে তার আইন ভঙ্গ করতে বাধা দেন, তার আইনের হিফাযত করতে উৎসাহ প্রদান করেন, অন্তরের মাঝে তাঁর সম্মান ও ভয় জাগ্রত করেন এবং তাঁর পবিত্রতাকে নষ্ট করতে বারণ করেন। সুতরাং কে এই ক্ষমতাধর ও মহা শক্তিশালী বাদশাহ? এর উত্তরে আমি বলব, নিয়ম-পদ্ধতির মর্যাদার হিফাযত, সমাজকে ধরে রাখা ও তার নিয়মের স্থিতিশীলতার নিশ্চিয়তা এবং শান্তির কারণ সমবেতে ও তাতে আস্থা লাভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে দীনদারিতার (ধার্মিকতার) শক্তির

সমকক্ষ অথবা তার কাছাকাছি আর কোনো শক্তি নেই।

এর মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা হচ্ছে; মানুষ সমস্ত সৃষ্টি-জীবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ তার সকল ঐচ্ছিক চালচলন ও কার্যকলাপকে পরিচালনা করে এমন এক বস্তু, যা কোনো কান শুনেনি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি। তা হলো তার ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস, যা আত্মাকে সংশোধন এবং দেহকে পবিত্র করে। সুতরাং মানুষ সর্বদাই সঠিক অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং যদি তার আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয়, তাহলে তার সব কিছুই সঠিক হবে। আর

যদি তা বাতিল ও ভ্রান্ত হয়, তাহলে সবকিছুই বাতিল হয়ে যাবে।

ঈমান এবং আকীদা-বিশ্বাস এ দু’টি মানুষের ব্যক্তি সত্তার নিয়ন্ত্রক বা পর্যবেক্ষক। এ দু’টি, যেমনটি সাধারণভাবে মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা যায়, দুই প্রকার:

১। শ্রেষ্ঠ জিনিসের মূল্যায়ন, মানুষের মর্যাদা ও এ ধরনের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর ঈমান; উঁচু মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি যার প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করে। এমনকি যদিও তাকে বাইরের বা বস্তুগত বিষয়াদি থেকে অব্যাহতিও প্রদান করা হয়।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি ঈমান রাখা, আর এটা(র ওপর ঈমান রাখা) যে তিনি সকল গোপন বিষয়ের যথাযথ পর্যবেক্ষক, ফলে তিনি সকল গোপন বিষয় এবং যা গোপনের চেয়েও গোপন তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। শরী‘আতের আদেশ-নিষেধের ক্ষমতা তাঁরই মদদপুষ্ট। আত্মিক অনুভূতি তাঁরই লজ্জায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। হয় তাঁর প্রতি ভালোবাসার কারণে অথবা তাঁর ভয়ে অথবা একসাথে উভয়টির কারণে। ... আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমানের এই প্রকারটিই ক্ষমতার দিক দিয়ে মানবাত্মার ওপর অধিক শক্তিশালী, প্রবৃত্তির তাড়না ও

আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধের দিক দিয়ে তীব্রতর এবং বিশেষ ও সর্বসাধারণ তথা সকল মানুষের অন্তরে বাস্তবায়নের দিক দিয়ে দ্রুততম।

এ কারণেই ন্যায়বিচার ও ইনসাফের মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের মাঝে পারস্পরিক আচরণ সম্পাদন করার জন্য দীনই হলো সর্বোত্তম গ্যারান্টি। এ জন্যই দীন সামাজিকভাবে প্রয়োজন। সুতরাং দীন কোনো জাতির সে স্থানে যদি অবস্থান নেয়, শরীরের যে স্থানে অন্তর অবস্থান নিয়েছে, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।[২৫]

দীনরে অবস্থান যখন এমন পর্যায়ে, তখন বর্তমান এই পৃথবিীতে বহুসংখ্যক দীন ও মল্লিাত দৃশ্যমান, আবার তাদরে প্রত্যকে গোষ্ঠীই তাদরে কাছে যে দীন আছে তা নয়িে আনন্দতি, তারা সটোকে কঠনিভাবে আঁকড়ে ধরওে আছে, এমতাবস্থায় সত্য দীন কোনটি, যা মানব মনরে যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে? আর সত্য দীনরে মূলনীতগিুলি বা কী?

সত্য দীনরে চনোর উপায়

প্রত্যকে ধর্মাবলম্বী বশি্বাস করে, একমাত্র তার ধর্মই সত্য এবং প্রত্যকে ধর্মরে অনুসারীরা মনে করে যে, তাদরে ধর্মই সর্বশ্রষ্েঠ ও

অধকিতর সঠকি পথ। আপনি যখন বকি্ৃত অথবা মানবরচতি ধর্মরে অনুসারীদরে নকিট তাদরে বশি্বাসরে সপক্ষে দলীল জানতে চাইবনে তখন তারা যুক্তি পশে করে য়ে, তারা তাদরে বাপ-দাদাদরেকে এ পদ্ধতরি ওপর পয়েছে, সুতরাং তারা তাদরে পদাঙ্ক অনুসরণকারী। অতঃপর তারা বভিন্নি প্রকার ঘটনা ও সংবাদ বর্ণনা করে যার সূত্র বশিুদ্ধ নয় এবং তার মূল অংশ (আসল ঘটনা) দোষ ত্রুটি ও নন্দিা থকেে মুক্ত নয়। আর তারা উত্তরাধকিার সূত্রে পাওয়া এমন সব কতিাবরে ওপর নরি্ভর কর, যগেুলো কে বলছে, কে লখেছে, প্রথম তা কোন ভাষায় লখো হয়ছেলি, কোন

দশে তা পাওয়া গয়িছেলি, তা জানা যায় না। বরং এগুলো মশি্রতি ও বজিড়তি কছিু গল্প-কাহনিী যা একত্রতি করা হয়ছেলি, তারপর সটোতে মহত্ব চাপয়িে দয়াে হয়, অতঃপর সূত্র পরীক্ষা করা, ভাষ্য সংরক্ষণরে জন্য জ্ঞানসম্মত তদন্ত ছাড়াই প্রজন্মরে পর প্রজন্ম সটো ধারণ করে আসছে।

এ সমস্ত অজ্ঞাত কতিাবাদী, গল্প কাহনিী এবং অন্ধ অনুকরণ দীন ও আকীদার ক্ষত্রে দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। অতএব, বকিৃত ও মানবরচতি ধর্মগুলোর সবগুলো কি সঠকি নাকি বাতলি?

সবগুলোই সত্যের ওপর আছে, এটা বলা অসম্ভব, কারণ সত্য একটিই, একাধিক নয়। আর এসব প্রত্যেকে বিকৃত ও মানবরচিত ধর্মগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে এবং সবগুলোই সত্য এটাও অসম্ভব। আর এসব ধর্ম যখন একাধিক অথচ সত্য একটিই, তাহলে সত্য কোনটি? অতএব অবশ্যই এমন কতগুলো মূলনীতি রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা বাতিল দীন থেকে সত্য দীনকে জানতে পারবো। সুতরাং আমরা যদি কোনো দীনে এই মূলনীতির প্রয়োগ যথার্থরূপে দেখতে পাবো তখনই জানবো যে, এটাই সত্য। পক্ষান্তরে যদি এই মূলনীতিগুলো অথবা তার একটি কোনো দীনে

ত্রুটিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হয়, তাহলে জানবো যে, এটা বাতিল।

যে মূলনীতির দ্বারা সত্য দীন ও বাতিল দীনের মাঝে আমরা পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবো তা নিম্নরূপ:

১- সেই দীন হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যা তিনি একজন ফিরিশতার (জিবরীল ‘আলাইহিস সালামের) মাধ্যমে তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন, যাতে করে তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট তা প্রচার করেন; কারণ সত্য দীন তো আল্লাহরই দীন। তিনি কিয়ামতের দিন মানুষ ও জিন্নের বিচার করবেন ও হিসাব নিবেন ঐ দীনের ভিত্তিতে, যা

তিনি তাদের নিকট অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ١٦٣﴾ [النساء : ١٦٣]

“নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট অহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ করেছিলাম। আর ইবরাহীম, ইসমা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব ও তার বংশধরগণ, ‘ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও অহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান

করেছিলাম যাবূর।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

এর ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দীন পালন করে এবং তা আল্লাহ ব্যতীত নিজের দিকে সম্বন্ধ

করে, তাহলে নিশ্চিতরূপে সেই দীন বাতিল।

২- সেই দীন শুধুমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদাত করার দিকে এবং শির্ক ও শির্কের দিকে ধাবিত করে এমন যাবতীয় মাধ্যমকে হারাম সাব্যস্ত করার আহ্বান করে। কারণ, এক আল্লাহরই ইবাদাত তথা তাওহীদের দিকে আহ্বান করা নবী ও রাসূলগণের দা‘ওয়াতের মূল বুনিয়াদ। প্রত্যেক নবী তার আপন জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ٧٣﴾ [الاعراف: ٧٢]

“তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সত্য মা‘বুদ নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৭২]

এর ওপর ভিত্তি করে যদি কোনো দীন শির্ককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো নবী, ফিরিশতা অথবা ওলীকে অংশীদার করে, তাহলে সেই দীন বাতিল, যদিও সেই দীনের অনুসারীরা তাদেরকে নবীদের মধ্য থেকে কোনো নবীর দিকে সম্পৃক্ততার দাবী করে।

৩- সেই দীন যেন ঐ মূলনীতির সাথে ঐকমত্য হয় যার দিকে সমস্ত রাসূল আহ্বান করেন। যথা- একমাত্র

আল্লাহর ইবাদাত, তাঁর পথে মানুষকে আহ্বান, আর শির্ক হারাম সহ পিতা-মাতার অবাধ্যতা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে হারাম সাব্যস্ত ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١﴾

[الانعام: ١٥١]

“(হে মুহাম্মাদ) বলুন, ‘এসো, তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা তিলাওয়াত করি, তা হচ্ছে, ‘তোমরা তাঁর সাথে কোনো শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে

থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের ধারে-কাছেও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না।' তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা আন'আম, আয়াত: ১৫১]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ ٤٥﴾ [الزخرف: ٤٥]

"আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন,

আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদাত করা যায় এমন কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম?” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪৫]

৪- সেই দীনে যেন পরস্পরবিরোধী নিয়ম এবং একটা আরেকটার বিপরীত না হয়। সুতরাং তা এমন কোনো বিষয়ের আদেশ করবে না, যা অপর কোনো আদেশ দিয়ে ভঙ্গ করে দেয়। অনুরূপ কোনো জিনিসকে হারাম করবে না, যা পরে বিনা কারণে তার অনুরূপ জিনিসকে বৈধ করে এবং কোনো বস্তুকে এক শ্রেণির জন্য হালাল করে আবার তা অন্য শ্রেণির জন্য হারাম করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء:٨٢]

“তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক মতানৈক্য পেতো।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২]

৫- সেই দীন যেন এমন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যা আদেশ, নিষেধ, হুশিয়ারি, আখলাক ইত্যাদি বিধান করার মাধ্যমে মানুষের দীন, মান-সম্মান, সম্পদ, জীবন ও বংশ এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে হিফাযত করে।

৬- সেই দীন হবে সকল সৃষ্টজীবের জন্য রহমতস্বরূপ, তারা তাদের নিজেদের এবং তাদের পরস্পরের প্রতি যুলুম করা হতে হবে মুক্ত। চাই এ যুলুম হক নষ্ট করার মাধ্যমে হোক অথবা কল্যাণ কুক্ষিগত করার মতো স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে হোক অথবা বড়দের দ্বারা ছোটদেরকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে হোক। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সে রহমত সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, যা তিনি মূসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন:

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلۡغَضَبُ أَخَذَ ٱلۡأَلۡوَاحَۖ وَفِي نُسۡخَتِهَا هُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ هُمۡ لِرَبِّهِمۡ يَرۡهَبُونَ ١٥٤﴾ [الاعراف: ١٥٤]

“আর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হলো, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য সে কপিগুলোতে যা লিখিত ছিল তাতে ছিল হিদায়াত ও রহমত।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৪]

মহান আল্লাহ ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়াত সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٞۖ وَلِنَجۡعَلَهُۥٓ ءَايَةٗ لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةٗ مِّنَّاۚ وَكَانَ أَمۡرٗا مَّقۡضِيّٗا ٢١﴾ [مريم: ٢١]

“সে বলল, ‘এ রূপই হবে।’ তোমার রব বলেছেন, ‘এটা আমার জন্য সহজ। আর আমরা তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যেন

সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমাদের কাছ থেকে এক রহমত; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার'।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২১]

মহিমান্বিত আল্লাহ সালেহ 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتۡ عَلَيۡكُمۡ أَنُلۡزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمۡ لَهَا كَٰرِهُونَ ٢٨﴾ [هود: ٢٨]

"তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর সেটা তোমাদের কাছে

গোপন রাখা হয়, আমরা কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর?” [সূরা হূদ, আয়াত: ২৮]

মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا ٨٢﴾ [الاسراء: ٨٢]

“আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২]

৭- সেই দীন যেন আল্লাহর বিধানের দিকে পথপ্রদর্শন করাকে অন্তর্ভুক্ত

করে। আর আল্লাহ মানুষের নিকট কী চান সে দিকে তাকে পরিচালিত করে এবং তাকে সংবাদ দেয় যে, সে কোথা থেকে এসেছে ও কোথায় তার গন্তব্য?

আল্লাহ তা‘আলা তাওরাত সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ ٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]

“নিশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত এবং আলো।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 44]

আর তিনি ইঞ্জিল সম্পর্কে বলেন,

﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٤٦]

“আর আমরা তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো; আর তা ছিল তার সামনে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশস্বরূপ।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৬]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ ٩﴾ [الصف: ٩]

“তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন।” [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৩]

আর সত্য দীন তো এটাই, যা আল্লাহর বিধানের দিকে পথপ্রদর্শন করাকে লালন করে এবং জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করে। যেহেতু সে মনের সকল দ্বিধা দূর করে এবং প্রত্যেকে জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় ও প্রত্যেকে সমস্যার সমাধান করে।

৮- সেই দীন যেনে উত্তম চরিত্র এবং সৎকর্মের দিকে আহ্বান করে। যেমন, সত্যবাদিতা, ইনসাফ, আমানত, লজ্জা, পবিত্রতা, উদারতা ইত্যাদি। আর

খারাপ কাজ হতে নিষেধ করে। যেমন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মানুষ হত্যা, অশ্লীলতা নিষিদ্ধ, মিথ্যা, যুলুম, অবিচার, কৃপণতা ও পাপাচার।

৯- সেই দীন যেনে ঐ ব্যক্তির কল্যাণ নিশ্চিত করে যে তার ওপর ঈমান আনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ طه ١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢ ﴾ [طه: ١، ٢]

“ত্বা-হা। (হে মুহাম্মাদ!) আপনাকে কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত করার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১, ২]

আর তা যেনে সঠকি ফৎিরাত বা মানব মনরে স্বাভাবকি প্রকৃতরি সাথে মলিে যায়,

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠]

“আল্লাহর ফতিরাত (স্বাভাবকি রীতি বা দীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যে‌াগ্য করে) তনিি মানুষ সৃষ্টি করছেনে; আল্লাহর সৃষ্টরি কে‌ানে‌া পরবির্তন নইে। এটাই প্রতষি্ঠতি দীন; কন্তিু অধকিাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০]

আর তা যেনে বশিুদ্ধ ববিকেরে সাথওে মলিে যায়; কারণ সঠকি দীন তে‌া হলে‌া

আল্লাহর শরী‘আত। আর বিশুদ্ধ বিবেকও আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাই আল্লাহর শরী‘আত এবং তাঁর সৃষ্টি পরস্পরবিরোধী হওয়া অসম্ভব।

১০- সেই দীন যেন সত্যের পথ দেখায় এবং বাতিল হতে সতর্ক করে। হিদায়াতের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং ভ্রষ্টতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর মানুষকে এমন এক সিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সোজা সরল পথের দিকে আহ্বান করে, যার মধ্যে কোনো প্রকার বক্রতা নেই। আল্লাহ তা‘আলা ঐসব জিন্নদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, যখন তাদের একদল কুরআন পড়া শুনে পরস্পর বলছিল,

﴿قَالُواْ يَٰقَوۡمَنَآ إِنَّا سَمِعۡنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٣٠﴾ [الاحقاف: ٣٠]

“তারা বলছেলি, ‘হে আমাদরে সম্প্রদায়! নশি্চয় আমরা এমন এক কতিাবরে পাঠ শুনছে যা নাযলি হয়ছেে মূসার পর,ে এটা তার সম্মুখস্থ কতিাবকে সত্যায়ন কর এবং সত্য ও সরল পথরে দকিে হদিায়াত কর।ে” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩০]

সুতরাং, যাতে দুর্ভোগ রয়ছেে এমন কছিুর দকিে তা তাদরেকে আহ্বান করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলনে,

﴿ طه ١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢ ﴾ [طه: ١، ٢]

“ত্বা-হা। (হে মুহাম্মাদ!) আপনাকে দুর্ভোগে নিক্ষেপে করার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১, ২]

যার মধ্যে তাদের ধ্বংস রয়েছে তার নির্দেশও তাদেরকে করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء : ٢٩]

“আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

লিঙ্গ, বর্ণ ও গোত্রের কারণে তাদের অনুসারীদের মাঝে কোনো প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিতি হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি

তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

অতএব সত্য দীনের মধ্যে মর্যাদার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো, আল্লাহ ভীতি অর্জন।

যে নীতিমালার মাধ্যমে সত্য দীন এবং বাতিল দীনের মধ্যে পার্থক্য করা যায় তা উপস্থাপন এবং এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণস্বরূপ যা উল্লেখ করেছি তা এটাই প্রমাণ করে যে, এই সকল নীতিমালা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত সকল সত্যবাদী রাসূলগণের জন্য সার্বজনীন। এরপর দীন বা

ধর্মের প্রকারভেদ উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি।

দীন-ধর্মের বিবিধ প্রকার

মানবসমাজ ধর্মের দিক দিয়ে দু’ ভাগে বিভক্ত:

এক প্রকার, যাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব রয়েছে। যেমন, ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান ও মুসলিম। কিন্তু ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানগণ তাদের কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী আমল না করায়, আল্লাহকে ছেড়ে মানুষকে তাদের প্রভু বানিয়ে নেয়ায় এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া ইত্যাদি কারণে, আল্লাহ তা‘আলা

তাদের নবীগণের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন পাদ্রী বা পুরোহিতরা তাদের জন্য কিছু কিতাব লিখে দেয় আর ধারণা করে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। বরং এগুলো বাতিলপন্থীদের তৈরী করা এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি মাত্র।

পক্ষান্তরে মুসলিমদের কিতাব মহাগ্রন্থ ‘আল-কুরআন’ হচ্ছে সময়ের দিক দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ কিতাব এবং হিফাযতের দিক দিয়ে অধিকতর মজবুত। কারণ এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং

আল্লাহ, এর দায়িত্ব কোনো মানুষের ওপর তিনি ছেড়ে দেননি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমরা কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সংরক্ষণকারী।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

এ কুরআন বহু মানুষের বক্ষে (মুখস্থ) এবং কিতাবের আকৃতিতে (লিখিত) সংরক্ষিত রয়েছে। কারণ এটি এমন এক সর্বশেষ কিতাব, যার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এই মানবজাতির জন্য

হিদায়াত নিশ্চিত করেছেন। আর এটিকে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ স্থির করেছেন এবং একে স্থায়ী করেছেন। আর প্রত্যেক যুগে যে ব্যক্তিই এর সীমারেখা ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, এর শরী‘আত মোতাবেক আমল করবে এবং এর প্রতি ঈমান আনবে, তার জন্য তা সহজ করে দিয়েছেন। এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা পরবর্তী অনুচ্ছেদেই আসছে।[২৬]

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোনো কিতাব নেই। যদিও তাদের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এমন

কতিাব রয়ছে, যাকে তাদরে ধর্মগুরুর দকিে সম্বন্ধ করা হয়। যমেন- হনি্দু, অগ্নপিূজক, বৌদ্ধ, কনফূশী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আবরি্ভাবরে পূর্বরে আরব।

বস্তুত প্রত্যকে জাতরি নজিস্ব এমন কছিু জ্ঞান ও কর্ম রয়ছে যার ভত্তিতিে তারা তাদরে পার্থবি জগতরে কল্যাণ সম্পাদন করে। এটা হচ্ছে ঐ সাধারণ হদিায়াত বা পথ দখোনোর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যকে মানুষকে দনে, বরং প্রত্যকে প্রাণীকে দনে। যমেন তনি প্রাণীকে পথ দখোন এমন জনিসি অর্জন করার,

যা খেলে ও পান করলে তার উপকার হবে এবং এমন বস্তু দূর করার যা তার ক্ষতি করবে। আবার আল্লাহ তা‘আলা এদের মধ্যে এগুলোর কোনো বস্তুর আসক্তি, অপর কোনো বস্তুর প্রতি অনীহাও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣﴾ [الاعلى: ١، ٣]

“আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন। আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১-৩]

মূসা ‘আলাইহিস সালাম ফির‘আউনকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠﴾ [طه: ٥٠]

“তিনি বলেন, আমাদের রব তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথার্থ আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫০]

আর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বলেন,

﴿ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ ٧٨﴾ [الشعراء : ٧٨]

“যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৭৮][২৭]

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যারা সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করেন, তারা জ্ঞাত আছেন যে, কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সৎকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যারা ধর্মাবলম্বী নয় তাদের চেয়ে ধর্মাবলম্বীরা শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অমুসলিমদের কাছে যেসব কল্যাণকর বস্তু পাওয়া যায়, তার চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ পাওয়া যায় মুসলিমদের কাছে। এর কারণ হলো, জ্ঞান ও কর্ম দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত, যেমন: গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরি বা শিল্পকলা ইত্যাদি। এসব বিষয় ধর্মাবলম্বীদের

নিকট যেমন আছে, অন্যদের নিকটেও রয়েছে, বরং এ ব্যাপারে বিধর্মীরাই শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে যা শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, যেমন: আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দীন সম্পর্কিত জ্ঞান। এগুলো ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্দিষ্ট। এগুলোর মধ্যে এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে যার ব্যাপারে বিবেকপ্রসূত যুক্তিগত দলীল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর রাসূলগণ সৃষ্টিকুলকে যে পথপ্রদর্শন করেছেন ও যে পথে পরিচালিত করেছেন তা হলো, বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি প্রমাণ, সুতরাং তাদের সেসব প্রমাণকে বলা হবে, বিবেক ও শরী‘আতগ্রাহ্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রকার: যা রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ ছাড়া জানা যায় না। এগুলো ঐসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা যুক্তির দ্বারা অর্জন করার কোনো উপায় নেই। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কিত সংবাদ, তাঁর নাম, তাঁর গুণাবলি, যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে তার জন্য জান্নাতে কী নি‘আমত আছে, আর যে তার অবাধ্য হবে তার জন্য কী শাস্তি রয়েছে, তাঁর শরী‘আতের বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে তাদের নবীদের সংবাদ ইত্যাদি।[২৮]

বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা

বড় বড় ধর্মসমূহ ও এ সকল ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ ও শরী'আতগুলো তামাশাকারী ও খেলোকারী মানুষদের শিকার, বিকৃতকারী এবং কপট লোকদের হাতের ক্রীড়া, রক্তাক্ত ঘটনাবলী এবং গুরুতর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। অবশেষে সেটি তার আত্মারূপ মূল ও বাইরের আকার সবই হারিয়ে ফেলে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যদি ঐ সমস্ত ধর্মের প্রাথমিক অনুসারী এবং তাদের নবীগনকে পুনরায় পাঠানো হয়, তারাও এগুলোকে অস্বীকার করবেন এবং এগুলো তাদের প্রবর্তিত দীন, কিতাব ও শরী'আত নয় বলতে দ্বিধা করতেন না।

যেমন, ইয়াহূদী ধর্ম বর্তমানে বহু ধর্মীয় প্রথা ও রীতিনীতির সমাহার, যার মধ্যে না আছে কোনো আধ্যাত্মিক দিক আর না আছে কোনো জীবন; বরং সেটো বাদ দিলেও দেখা যাবে যে, এটি পরিণত হয়েছে একটি বংশগত ধর্মে, একটি জাতি ও গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। যা মূলত জগতের জন্য কোনো কল্যাণকর মিশন বহন করে না, না তাতে আছে কোনো জাতির প্রতি দাওয়াত, আর না তাতে রয়েছে মানবতার জন্য কোনো কৃপা।

এ ধর্ম তার মৌলিক সঠিক আকীদা-বিশ্বাসচ্যুত হয়ে ভ্রষ্ট হয়, অথচ

ধর্ম ও জাতিসমূহের মাঝে এটির একটি নাম-ডাক ছিল। তাতে ছিল এর মর্যাদার আসল রহস্য, অর্থাৎ আকীদাতুত তাওহীদ (একত্ববাদের বিশ্বাস) যার অসিয়ত তাদেরকে করেছিলেন ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে অনুরূপভাবে ইয়া'কুবও। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাদের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জাতি অথবা যারা তাদেরকে অধিনস্থ করেছিল তাদের অনেকে বাতিল বা ভ্রান্ত বিশ্বাস ও রীতিনীতি গ্রহণ করে নিয়েছিল, যা মূলত ছিল পৌত্তলিক মূর্খতায় পরিপূর্ণ। এ বাস্তবতা স্বীকার করেন ইনসাফপ্রিয় ইয়াহূদী ঐতিহাসিকগণ। যেমন,

“দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-

ইয়াহুদয়্যিাহ” নামক গ্রন্থে এসছে, যার অর্থ হলো-

‘মূর্তপিূজার প্রতি নবীগণরে রাগ ও ক্রোধই প্রমাণ করে য,ে মূর্তপিূজা ও বহু উপাস্যরে উপাসনা, ইসরাঈলীদরে অন্তরে চুপসিারে ঢুকে পড়ছেলি এবং তারা বভিন্নি প্রকার শরি্কী ও কুসংস্কারমূলক বশি্বাস গ্রহণ করে নয়িছেলি। তালমুদও নর্দিষ্টি করে সাক্ষ্য দয়ে য,ে পৌত্তলকিতার প্রতি ইয়াহূদীদরে বশিষে আকর্ষণ ছলি।’[২৯]

আর তালমুদে বাবলে[৩০] কতিাব, ইয়াহূদীরা যে কতিাবকে অত্যন্ত পবত্রি মনে করে থাক,ে এমনকি কখনও কখনও সটোকে তাওরাতরে উপরওে

প্রাধান্য দিয়ে থাকে, উক্ত কিতাবটি খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়াহূদীদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ কিতাবটিতে বিবেকের স্বল্পতা, ফালতু কথা, আল্লাহর ওপর দুঃসাহস করে কথা বলা, বাস্তব বিবর্জিত, দীন ও বিবেক নিয়ে তামাশা জনিত এমনসব উদ্ভট কথার সমাহার ঘটেছে, যা ঐ সময়ে ইয়াহূদী সমাজে জ্ঞানের অবক্ষয় ও দীনের ব্যাপারে বাতিল গ্রহণের প্রবণতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা প্রমাণ করে।[৩১]

পক্ষান্তরে খ্রিস্টান ধর্ম[৩২], যা প্রথম যুগ থেকেই সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা এবং

রোমান মূর্তিপূজক খ্রিষ্টানদের ফিতনার শিকার হয়।[৩৩] আর এসব কিছু এমন এক স্তূপে পরিণত হয় যার নীচে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মহান শিক্ষা দাফন হয়ে যায় এবং এগুলোর ঘন মেঘের আড়ালে তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্বের আলো ও একমাত্র আল্লাহর জন্য যে ইবাদত হওয়ার কথা তার একনিষ্ঠতা ঢাকা পড়ে যায়।

এক খ্রিষ্টান লেখক, চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে তাদের সমাজে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস কীভাবে ছেয়ে বসেছিল তার বর্ণনায় বলেন:

“এ বিশ্বাস যে, এক মা‘বুদ তিনি সত্তার সমন্বয়ে গঠিত[৩৪] এ মতবাদ খৃষ্টান বিশ্বের জীবনের অভ্যন্তরে ও তাদের চিন্তায় অনুপ্রবেশ ঘটে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষে চতুর্থাংশে। আর তা খৃষ্টীয় বিশ্বের সর্বত্র প্রথাগত নির্ভরযোগ্য আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে চলতে থাকে। আর ত্রিত্ববাদের আকীদাহ’র ক্রমবিকাশ ও তার গোপন রহস্য উন্মোচিত হয় খৃষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে।”[৩৫]

‘‘তারীখুল মাসীহিয়্যাহ ফী দ্বওইল ইলমিল মু‘আসির” বা “বর্তমান জ্ঞানের আলোকে খৃষ্টান ধর্মের

ইতিহাস” নামক গ্রন্থে সমসাময়িক এক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক তাদের সমাজে বিভিন্ন রূপরেখায়, বিভিন্ন ধরণ ও প্রক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা আবির্ভূত হওয়া, অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ, বিস্ময় ও মূর্খ নীতির মাধ্যমে অন্যান্য জাতি ও শির্কে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের অনেক নিদর্শন, প্রথা, উৎসব এবং মূর্তিপূজায় তাদের মিশে যাওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন:

“পৌত্তলিকতা শেষ হয়েছে, কিন্তু তা পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়নি, বরং তা অন্তরে প্রোথিত হয়ে গেছে এবং খ্রিষ্ট ধর্মের নামে ও তার আড়ালে তার সবকিছু অব্যাহত আছে। ফলে যারা

তাদের উপাস্য ও বীরদের পরিত্যাগ করেছে এবং মুক্ত হয়েছে, তারাই আবার তাদের শহীদদের মধ্য হতে কাউকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তাদেরকে উপাস্যের বিশেষণে ভূষিত করেছে। তারপর তাদের মূর্তি তৈরি করে। এভাবেই এই শির্ক ও মূর্তিপূজার প্রচলন ঐ সমস্ত আঞ্চলিক শহীদদের দিকে পরিবর্তিত হয়। আর এই শতাব্দী শেষ হতে না হতেই তাদের মাঝে শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের উপাসনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন আকীদাহ-বিশ্বাস রচিত হয়; আর তা হচ্ছে, ওলীগণ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বহন করেন এবং ঐ সমস্ত ওলী তথা আল্লাহর সৎ ব্যক্তি ও সাধকগণ আল্লাহ ও

মানুষের মাঝে মাধ্যম সৃষ্টি হিসেবে দেখা দেন। মূর্তিপূজা উৎসবের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়। অবশেষে খৃষ্টীয় চারশ' শতাব্দীতে প্রাচীন 'ঈদুশ শামস' সূর্য দেবতার উৎসব তার নাম পরিবর্তন করে নাম হয়ে যায়, 'ঈদু মীলাদিল মাসীহ' বা ঈসা মাসীহ এর জন্ম উৎসবে।"[৩৬]

আর অগ্নি-উপাসকগণ, বহু পূর্ব যুগ থেকেই তাদের মাঝে প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আগুন। সবশেষে তারা এর উপাসনায় লেগে যায়, এজন্য তারা প্রতিমূর্তি ও মন্দির তৈরি করে। ফলে দেশের সর্বত্র 'অগ্নি

উপাসনার ঘর’ ছড়িয়ে পড়ে এবং অগ্নিপূজা ও সূর্যপূজা ছাড়া তাদের যাবতীয় আকীদাহ-বিশ্বাস ও দীনের যাবতীয় বিধান নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের কাছে ধর্ম নিছক বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের সমষ্টিতে পরিণত হয়, যা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তারা পালন করে।[৩৭]

“ইরান ফী ‘আহদিস সাসানিয়্যীন” এর লেখক ডেনমার্কের প্রফেসর আর্থার কৃষ্টান সীন তাদের ধর্ম প্রধানদের স্তর এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করে বলেন: ‘ঐ সমস্ত কর্মকর্তাদের উপরে দিনে চার বার সূর্যের উপাসনা করা আবশ্যক ছিল

এবং তার সাথে চন্দ্র, আগুন ও পানির উপাসনাও যুক্ত করা হত। আর তারা আদিষ্ট ছিল আগুন যেন নিভে না যায়, পানি ও আগুন যেন এক সাথে স্পর্শ না করে এবং খনিজ পদার্থে যেন মরীচা পড়ার মতো; কারণ খনিজ পদার্থসমূহ তাদের নিকট পবিত্র ছিল।’[৩৮]

তারা সকল যুগেই দুই ইলাহে বিশ্বাসের নীতির অনুগত ছিল এবং এটা তাদের প্রতীকে পরিণত হয়। তারা দুই উপাস্যে বিশ্বাস রাখে। একজন নূর বা কল্যাণের দেবতা, যাকে তারা ‘আহোরা মাযদা বা ইয়াযদান’ নামে অভিহিত করে। আর দ্বিতীয়জন অন্ধকার বা অকল্যাণের দেবতা, তার নাম আহরমান। এদের উভয়

দবেতার মাঝে সংঘাত ও লড়াই সর্বদায় অব্যাহত আছে।[৩৯]

আর বৌদ্ধধর্ম, এই ধর্মটি ভারত ও মধ্য এশিয়ায় বসি্তার লাভ করছে, পৌত্তলকি একটি ধর্ম। এ ধর্মরে অনুসারীরা যখোনইে যায় এবং যখোনইে অবস্থান করে সখোনইে তারা তাদরে মূর্তি নয়িে যায়, মন্দরি তরৈি করে এবং গৌতম বৌদ্ধরে প্রতকিৃতি দাঁড় করায়।[৪০]

আর হনি্দুধর্ম, ভারতরে ধর্ম, বহু উপাস্য ও দবেতার ধর্ম হসিবেে খ্যাত। খ্রষি্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এর পৌত্তলকিতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছছেলি। তখন তাদরে দবেতার সংখ্যা

৩৩ কোটিতে পৌঁছে।[৪১] পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তু, সকল ভয়ঙ্কর বস্তু এবং সকল কল্যাণকর বস্তুই তাদের উপাস্য বা দেবতায় পরিণিত হয়েছে যাদের তারা উপাসনা করে। আর উক্ত যুগে প্রতিমা নির্মাণও বেড়ে যায় এবং নির্মাণ শিল্পীরা এতে খুব সুন্দর শিল্প দক্ষতা প্রদর্শন করে।

সি,ভি, বৈদ্য, হিন্দু তার ‘মধ্য ভারতের ইতিহাস’ নামক গ্রন্থে সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকাল ৬০৬-৬৪৮ খৃষ্টাব্দ সাল অর্থাৎ যে যুগটি আরবে ইসলামের আবির্ভাবের নিকটবর্তী ঐ যুগে মানুষের ধর্মীয়

অবস্থান কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

‘হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম দু’টিই পৌত্তলিকতার ধর্ম, যারা উভয়েই সমান ছিল। বরং সম্ভবত বৌদ্ধধর্মই পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে ছাড়িয়ে যায়। এ ধর্মের সূচনা হয় উপাস্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কিন্তু তারা পর্যায়ক্রমে গৌতম বুদ্ধকেই বড় উপাস্য বানিয়ে নেয়। অতঃপর তার সাথে আরও অনেক উপাস্যকে যুক্ত করে যেমন বৌদ্ধিসত্ত্ব[৪২], বস্তুত ভারতে তখন পৌত্তলিকতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এমনকি প্রাচ্যের কতক

ভাষাতে বুদ্ধ Buddha শব্দটি মূর্তি ও প্রতিমার সমার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৌত্তলিকতা বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তথা সমগ্র পৃথিবী পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত। বরং খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন সেমেটিক ধর্মগুলো মূর্তিকে সম্মানপ্রদর্শন ও পবিত্র করার ক্ষেত্রে যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে। তারা যেন সবাই প্রতিযোগিতার

ঘোড়ার মতো একই ময়দানে দৌড়াচ্ছে।[৪৩]

অন্য আরেক হিন্দু তার লিখিত ‘আল হিন্দুকিয়্যাতুস সায়িদাহ’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করে যে, মূর্তি তৈরির কাজ এখানেই শেষ হত না বরং ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই ‘উপাস্য পল্লীতে’ অনেক বেশি সংখ্যায় ছোট ছোট উপাস্য অন্তর্ভুক্তকরণ চলতে থাকে। এমনকি তাদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে গেল যে তা গণনা করে শেষ করা যাবে না।[৪৪]

এ তো হলো ধর্মগুলোর অবস্থা। পক্ষান্তরে সভ্য দেশগুলোতে (!), যেখানে বিশাল শাসনব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে সভ্যতা, শিল্প ও সাহিত্যের ঠিকানা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সে সব দেশে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সেখানকার ধর্মসমূহ বিকৃত হয়ে পড়েছে। সেসব দেশে তার মৌলিকত্ব, শক্তি-সাহস হারিয়েছে। সংস্কারকরা হারিয়ে গিয়েছে। শিক্ষকশূণ্য হয়ে পড়েছে। নাস্তিকতা সেখানে ঘোষণা দিয়ে ঝেঁকে বসেছে। ফিতনা ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাল-মন্দের মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। যার কারণে আত্মহত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সামাজিক

বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মানসিক রোগীদের সংখ্য এত বেড়ে গেছে যে মানসিক ডাক্তারদের চেম্বার রোগীতে গিজগিজ করছে। যাদুকর ও ভেলকিবাজদের বাজার কায়েম হয়েছে। সেখানে মানুষ প্রত্যেকে উপভোগ ও প্রমোদের জিনিস পরীক্ষা করে দেখেছে। প্রত্যেকে যা ইচ্ছে নব্য মতবাদ গ্রহণ করছে, এই আশায় যে, তার তার আত্মাকে পরিতৃপ্ত ও সুখী করবে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। কিন্তু সেসব আনন্দ-প্রমোদ, ধর্ম এবং মতবাদ কোনো সফলতাই তাদের জন্য বয়ে আনতে পারেনি। বস্তুত এ মানসিক হতাশা-দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশে, আত্মিক শাস্তি ও দূর্ভোগ

তার চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত না হবে এবং তিনি তার নিজের জন্য যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন ও তাঁর রাসূলগণকে যার আদেশ করেছিলেন সে মোতাবেক তাঁর ইবাদাত না করবে। মূলত যে ব্যক্তি তার রব হতে বিমুখ হয় এবং অন্যের নিকট হিদায়াত চায়, আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কারভাবে তাদের অবস্থা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো

অন্ধ অবস্থায়।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৪]

পক্ষান্তরে এই পার্থিব জীবনে মুমিনদেরে নিরাপত্তা ও সফলতার সংবাদ জানিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: ৮২]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلۡجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَۖ عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ ١٠٨﴾ [هود: ١٠٨]

“আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্যরূপ ইচ্ছে করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১০৮]

ইসলাম ছাড়া বাকী অন্যান্য সকল ধর্মের ক্ষেত্রে যদি সত্য দীনের মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করি, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ঐ সমস্ত

উপাদানের অধিকাংশই সেগুলোতে অনুপস্থিত, যেমন এ সম্পর্কে উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে তা স্পষ্ট হয়েছে।

এই ধর্মগুলো সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি বাদ দিয়ে তা হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। এ ধর্মগুলোর অনুসারীরা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যদেরকে অংশীদার স্থির করে। তেমনিভাবে এই বিকৃত ধর্মগুলো মানুষের সামনে এমন শরী‘আত পেশ করেনি যা সকল যুগে ও সকল স্থানের জন্য উপযুক্ত, যা মানুষের দীন, সম্মান, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ও রক্তসমূহের হিফাযত করবে। আর

ঐসব ধর্ম তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশিত শরী‘আতের দিকেও পরিচালিত করে না এবং তার অনুসারীদেরকে প্রশান্তি ও সুখ প্রদান করে না। কারণ এগুলোর মাঝে অনেক বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পক্ষান্তরে দীন ইসলাম, যার আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আসছে, যাতে পরিষ্কার হবে যে, তা (ইসলাম) আল্লাহর মনোনীত সত্য ও কিয়ামত অবধি স্থায়ী দীন; যার প্রতি তিনি স্বয়ং সন্তুষ্ট এবং সকল মানবগোষ্ঠীর জন্যও তার পছন্দকৃত।

আর এ পরিচ্ছেদে শেষে নবুওয়াতের হাকীকত, তার নিদর্শনাবলি, মানুষের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা, রাসূলগণের দা‘ওয়াতের নীতিমালা এবং সর্বশেষে রিসালাতের পরিসমাপ্তিকারী ও চিরস্থায়ী রিসালাতের হাকীকত আলোচনা করা উপযোগী হবে বলে আমি মনে করছি।

নবুওয়াতের তাৎপর্য

বর্তমান এ জীবনে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার রবের পরিচয় জানা, যিনি তাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন এবং তার ওপর অগণিত নি‘আমত ঢেলে দিয়েছেন। আর মহান আল্লাহর

সৃষ্টিকুল সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র তাঁর ইবাদাত সম্পন্ন হওয়া।

কিন্তু মানুষ তার রবকে যথাযথভাবে কীভাবে চিনবে, তাঁর কী কী অধিকার ও নির্দেশাবলি রয়েছে এবং সে কীভাবে তার মনিবের ইবাদাত করবে? মানুষ (দুনিয়ার জীবনে) খুব সহজেই খুঁজে পায় বিপদে কে তার সাহায্য করবে এবং কে তার সহযোগিতা মূলক কাজ করবে, যেমন- রোগের চিকিৎসা করা, ঔষধ সরবরাহ, বাসস্থান নির্মাণে সহযোগিতা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ। কিন্তু সমগ্র মানুষের মাঝে সে এমন কাউকে পাবে না, যে তার প্রভুর

পরিচয় সম্পর্কে তাকে (বিবেক দ্বারা) অবহিত করবে এবং কীভাবে সে তার প্রভুর ইবাদাত করবে তা বর্ণনা করবে; কারণ কোনো বিবেকেই আল্লাহ তার কাছে কী চান তা জানতে সক্ষম নয়। বস্তুত যেখানে একজন মানুষ তার মতো আরেকজন মানুষের ইচ্ছার কথা, তাকে অবহিত করার পূর্বে জানার ক্ষেত্রে দুর্বল, সেক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের কথা জানা কীভাবে সম্ভব। কেননা, এই গুরু দায়িত্ব তো নবী ও রসূলগণের ওপর সীমিত, যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে রিসালাত পৌঁছানোর জন্য মনোনীত করেছেন। আর পরবর্তীতে যেসব আলেম ও নবীগণের ওয়ারিশ

আসবে তাদের দায়িত্ব হলো, তারা তাদের পদ্ধতি মেনে চলবে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের পক্ষ থেকে রিসালাত পৌঁছে দিবে। কারণ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শরী‘আতের বিধি-বিধান গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা এর সামর্থ্য রাখে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحۡيًا أَوۡ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوۡ يُرۡسِلَ رَسُولٗا فَيُوحِيَ بِإِذۡنِهِۦ مَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٞ ٥١﴾ [الشورى: ٥١]

“আর কোনো মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার

আড়াল ছাড়া, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা অহী করেন, তিনি সর্বোচ্চ, হিকমতওয়ালা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫১]

সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিধি-বিধান বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই একজন মাধ্যম ও দূত প্রয়োজন। আর এ সকল দূতগণই হলেন নবী ও রাসূল। ফিরিশতা নবীর নিকট আল্লাহর রিসালাত নিয়ে আসেন, তারপর নবী তা মানুষের নিকট পৌঁছান। কিন্তু ফিরিশতা কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের নিকট রিসালাত নিয়ে আগমন করেন না। কারণ

স্বভাবগত দিক থেকে ফিরিশতাদের জগত মানুষের জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥]

“আল্লাহ ফিরিশতাদের মধ্য থেকে দূত (বাণী বাহক) মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৫]

আল্লাহর প্রজ্ঞা চেয়েছেন যে, তিনি রাসূলদেরকে তাদের স্বজাতির মধ্য হতে চয়ন করবেন; যাতে করে তারা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং তাঁর থেকে বুঝতে পারে, কারণ

তারা তাকে সম্বোধন করতে পারবে ও তার সাথে কথা বলতে পারবে। যদি ফিরিশতাদের মধ্য থেকে কাউকে রাসূল করে পাঠানো হতো তাহলে তারা তার মুখামুখি অবস্থান করতে পারতো না এবং কোনো কিছু গ্রহণ করতেও পারতো না।[৪৫]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ مَلَكٞۖ وَلَوۡ أَنزَلۡنَا مَلَكٗا لَّقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨ وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ مَلَكٗا لَّجَعَلۡنَٰهُ رَجُلٗا وَلَلَبَسۡنَا عَلَيۡهِم مَّا يَلۡبِسُونَ ٩﴾ [الانعام: ٨، ٩]

“আর তারা বলে, ‘তার কাছে কোনো ফিরিশতা কেন নাযিল হয় না?’ আর যদি আমরা ফিরিশতা নাযিল করতাম, তাহলে

বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, তারপর তাদেরকে কোনো অবকাশ দেয়া হত না। আর যদি তাকে ফিরিশতা করতাম তবে তাঁকে পুরুষমানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮-৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ٢٠ ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَاۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا كَبِيرٗا ٢١﴾ [الفرقان: ٢٠، ٢١]

“আর আপনার আগে আমরা যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত এবং (হে মানুষ!) আমরা তোমাদের এক-কে অন্যের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? আর আপনার রব তো সর্বদ্রষ্টা। আর যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, ‘আমাদের কাছে ফেরিশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?’ তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০-২১]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾ [النحل: ٤٣]

“আর আপনার আগে আমরা অহীসহ কেবল পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি না জান।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤﴾ [ابراهيم: ٤]

“আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি

তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪]

এই সকল নবী ও রাসূল পূর্ণ বিবেক বুদ্ধি, সুস্থ ফিতরাত, কথা ও কাজে সত্যবাদিতা, অর্পিত দায়িত্ব প্রচারের ক্ষেত্রে আমানতদারিতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী এবং মানব চরিত্রকে কলঙ্কিত করে এমন সকল পাপ থেকে মুক্ত, দৃষ্টিকটু এবং সুস্থ রুচিবোধ যাকে অপছন্দ করে এমন কিছু থেকে শারীরিক সুস্থতার গুণে গুণান্বিত।

মানসকি ও চারত্রিকি দকি থকে মহান আল্লাহ তাদরেকে পাক-পবত্রি রখেছেনে।[৪৬] ফলে তারা সবচয়েে চরত্রিবান মানুষ। মনরে দকি থকেে সবচয়েে পবত্রি এবং প্রভাব, প্রতপিত্তি ও শক্তরি দকি থকে অতি সম্মানতি। আল্লাহ তা‘আলা তাদরে জন্য যাবতীয় উত্তম চরত্রি ও সুন্দর সুন্দর স্বভাবরে সমন্বয় ঘটয়িছেনে, যমেন তাদরে মধ্যে একত্রতি করছেনে সহষি্ণুতা, জ্ঞান, উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা, সাহসকিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা। এমনকি তারা তাদরে সম্প্রদায়রে মাঝে এ ধরণরে সুন্দর স্বভাবে শ্রষ্ঠে। যমেন, কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা সালহি ‘আলাইহসি

সালামরে জাত সিম্প্রক্ে সংবাদ দনে তারা তাকে বলছেলি:

﴿قَالُواْ يَٰصَٰلِحُ قَدۡ كُنتَ فِينَا مَرۡجُوّٗا قَبۡلَ هَٰذَآۖ أَتَنۡهَىٰنَآ أَن نَّعۡبُدَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكّٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ مُرِيبٖ ٦٢﴾ [هود: ٦٢]

“তারা বলল, হে সালহি! এর আগে তুমি ছলিে আমাদরে আশাস্থল। তুমি কি আমাদরেকে নষিধে করছ ইবাদাত করতে তাদরে, যাদরে ইবাদাত করত আমাদরে পতিৃ-পুরুষরো? নশি্চয় আমরা বভি্রান্তকির সন্দহেে রয়ছেি সে বষিয়ে, যার প্রত তুমি আমাদরেকে ডাকছ।” [সূরা আল-হূদ, আয়াত: ৬২]

শু‘আইব ‘আলাইহসি সালামরে সম্প্রদায় তাকে বলছেলি,

﴿قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ
ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ
ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٨٧﴾ [هود: ٨٧]

“তারা বলল, ‘হে শু‘আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষরা যার ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি তো বেশ সহিষ্ণু, সুবোধ!” [সূরা হূদ, আয়াত: ৮৭]

শেষে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর কাওমে “আল আমীন” উপাধিতে পরিচিতি ছিলেন। তাঁর

রব তাঁকে বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: ٤]

“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর রয়েছেন।” [সূরা আল-কলম, আয়াত: 4]

সুতরাং তারা সৃষ্টিকুলের সেরা। তিনি তাদেরকে রিসালাত বহন করার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ আমানত প্রচারের জন্য মনোনীত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥۗ﴾ [الانعام: ١٢٤]

“আল্লাহ তাঁর রিসালাত কোথায় অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো

জাননে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৪]

তনিি অন্যত্র বলনে,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣﴾ [آل عمران: ٣٣]

“নশ্চিয় আল্লাহ আদম, নূহ্ ও ইবরাহীমরে বংশধর এবং ইমরানরে বংশধরকে সমগ্র সৃষ্টজিগতরে উপর মনোনীত করছেনে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৩]

আর আল্লাহ তা‘আলার এ সকল নবী ও রাসূলগণরে উন্নতমানরে গুণাবলি বর্ণনা করা এবং তারা উচ্চ গুণে পরচিতি লাভ করা সত্ত্বওে তারা

ছিলেন মানুষ। তারা ঐ সব মানবীয় গুণে গুণান্বিত হন যেমন অন্য সকল মানুষও সেসব গুণের অধিকারী হয়। যেমন, তারা ক্ষুধার্ত হন, অসুস্থ হন, ঘুমান, খাবার খান, বিবাহ শাদী করেন এবং মারা যান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّكَ مَيِّتٞ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٣٠﴾ [الزمر: ٣٠]

“আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩০]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ﴾ [الرعد: ٣٨]

“আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।” [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ৩৮]

বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হতেন অথবা তাদেরকে হত্যা করা হতো অথবা নিজ বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হতেন। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

“আর স্মরণ করুন, যখন কাফেরেরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে

আপনাকে বন্দী করার জন্য, বা হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে) ষড়যন্ত্র করেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]

তথাপিও দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণতি, সাহায্য ও সহযোগিতা বিদ্যমান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢١﴾ [المجادلة: ٢١]

“আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ‘আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও’। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।” [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২১]

নবুওয়াতের নিদর্শনাবলি

সর্বোত্তম জ্ঞান শিক্ষা এবং সর্বোত্তম কাজ পালন করার মাধ্যম যেহেতু নবুওয়াত, তাই আল্লাহ তা‘আলার অশেষ রহমত যে, তিনি এ সমস্ত নবীদেরকে এমন কিছু আলামত প্রদান করেছেন যা তাদের সত্যতা প্রমাণ করে এবং মানুষেরা এর মাধ্যমে তাদের যুক্তি প্রদর্শন করে ও তাদেরকে চিনতে পারে। যদিও যে কেউই

নবুওয়াত দাবী করে তার ক্ষেত্রে এমন সব লক্ষণ ও অবস্থাদি প্রকাশ পায়, যা তার সততা প্রমাণ করে, যদি সে সত্যবাদী হয়। আর তার মিথ্যা দাবী তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। এই সকল আলামত অনেক, তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলামত নিম্নে পেশ করছি:

১- রাসূল, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আর আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুর ইবাদাত পরিত্যাগ করার আহ্বান করবেন। কারণ একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

২- তিনি মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে, তাঁকে বিশ্বাস করতে এবং তাঁর রিসালাতের প্রতি আমল করার আহ্বান করেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলার আদেশ করেন যে,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“বলুন, ‘হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

৩- আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে নবুওয়াতের বিভিন্ন প্রকার দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা সাহায্য করেন। এ সমস্ত প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে সে সব নিদর্শনসমূহ, যা নিয়ে নবী-রাসূলগণ আগমন করেন, তার স্বজাতিরা সেটা প্রতিরোধ করতে অথবা তার অনুরূপ কিছু আনতে সক্ষম হয় না। যেমন- মূসা ‘আলাইহিস সালামের নিদর্শন, যখন তার লাঠি সাপে পরিণত হয়; ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নিদর্শন, যখন তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ করেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদর্শন, যথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, এমন নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও যে, তিনি

পড়তে ও লিখতে জানেন না, ইত্যাদি নবীদের অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে।

আর নবী ও রাসূলদের নিয়ে আসা এ নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে, তারা যা নিয়ে এসেছেন তা এমন স্পষ্ট ও মহা সত্য যে, শত্রুরা তাকে প্রতিহত বা অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তারা জানে যে, নবীগণ যা নিয়ে আগমন করেন তা এমন স্পষ্ট মহা সত্য যাকে প্রতিহত করা যায় না।

এ সকল নিদর্শনের অন্যতম হচ্ছে, যা আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূলগণকে বিশেষ করে দিয়েছেন, তাদের পূর্ণ অবস্থা (বিকলাঙ্গ বা অনুরূপ কিছু না

হওয়া), মহৎ গুণ এবং উদার স্বভাব-চরিত্র।

এসব নদির্শনরে অন্যতম হলো, নবী-রাসূলগণরে জন্য তাদরে শত্রুদরে বরিুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এবং তারা যদেকিে আহ্বান করনে তা প্রচার-প্রকাশ করতে সমর্থ হওয়া।

৪- প্রত্যকে নবী-রাসূলরে আহ্বান, মৌলকিভাবে অপর সকল নবী ও রাসূল যে বষিয়রে দকিে আহ্বান করছেনে, সগেুলোর সাথে মলি থাকবে।

৫- তনিি কখনো তাঁর নজিরে ইবাদাত-উপাসনা করা অথবা ইবাদাতরে কোনো কছিু তাঁর দকিে নবিদ্ধ করা অথবা তাঁর

সম্প্রদায় বা গোত্র-গোষ্ঠীর বিশেষ সম্মান করা ইত্যাদির দিকে আহ্বান করেন না। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেন, তিনি যেন মানুষকে একথা বলেন,

﴿قُلۡ لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ﴾ [الانعام: ٥٠]

“(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন! আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের কোনো জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা।

আমার কাছে যা কিছু অহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫০]

৬- তিনি তাঁর দা‘ওয়াতের বিপরীতে মানুষদের কাছে পার্থিব দুনিয়ার কোনো সম্পদ তলব করেন না। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী যেমন- নূহ ‘আলাইহিস সালাম, হূদ ‘আলাইহিস সালাম, সালেহ ‘আলাইহিস সালাম, লুত ‘আলাইহিস সালাম, শু‘আইব ‘আলাইহিস সালামকে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা তাদের স্বজাতিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠٩﴾ [الشعراء : ١٠٩]

“আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো বিশ্বজাহানের রবের নিকটই আছে।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪ ও ১৮০]

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতিকে বলেন,

﴿قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ ٨٦﴾ [ص : ٨٦]

“(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন! আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি

বানোয়াটদের (ভানকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৮৬]

আর এই সমস্ত নবী ও রাসূল, যাদের সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নবুওয়াতের নিদর্শনাবলি আপনাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করলাম, তাদের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত

করবে এবং তাগুতের পূজা বর্জন করবে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

মানুষ তাদের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং ইতিহাস তাদের সংবাদ লিপিবিদ্ধ করে আনন্দিত হয়েছে। তাদের দীনের বিধানাবলি সন্দেহাতীত অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে হক ও ইনসাফ। এমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে সাহায্য করেছেন এবং তাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন তাও বর্ণিত হয়েছে সন্দেহাতীত অবিচ্ছিন্নভাবে। যেমন- নূহ ‘আলাইহিস সালামের জাতির তুফান, ফির‘আউনের সাগরে ডুবে যাওয়া, লূত ‘আলাইহিস সালামের জাতির ‘আযাব,

মুহাম্মাদ ‘আলাইহিস সালামের তাঁর শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ এবং তাঁর দীনের প্রসার ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো জানবে সে নিশ্চিতরূপে অবগত হবে যে, তারা এসেছিলেন কল্যাণ ও হিদায়াত নিয়ে এবং মানবজাতিকে সে পথপ্রদর্শন করাতে যা তাদের উপকার করবে, সাবধান করাতে সে পথ থেকে যা তাদের ক্ষতি করবে। তাদের সর্বপ্রথম হলেন নূহ ‘আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মানুষের জন্য রাসূলের প্রয়োজনীয়তা

নবীগণ হলনে আল্লাহর প্ররেতি দূত। তারা তাঁর বাণীসমূহ মানুষরে কাছে পৌঁছে দনে। যারা তাঁর আদশেসমূহ পালন করে তাদরেকে আল্লাহ যসেব নি'আমত প্রস্তুত করে রখেছেনে তার সুসংবাদ দনে এবং যারা তাঁর নষিধোবলি অমান্য করে তারা তাদরেকে চরিস্থায়ী ‘আযাবরে ভীতি প্রদর্শন করনে। আর তারা তাদরেকে পূর্ববর্তী জাতরি সংবাদ এবং তাদরে পালনকর্তার হুকুম অমান্য করার কারণে দুনয়িাতে তাদরে ওপর যে ‘আযাব অবতীর্ণ হয়ছে তা বর্ণনা করনে।

আল্লাহর আদশে ও নষিধে জানার ক্ষত্রে মানুষরে ববিকে যথষ্টে হওয়া

অসম্‌ভব। যার কারণে আল্‌লাহ তা‘আলা মানুষরে মর্‌যাদা ও তাদরে স্‌বার্‌থ সংরক্‌ষণরে জন্‌য শরী‘আত নর্ি‌ধারণ করছেনে এবং আদশে ও নষিধেসমূহ জারি করছেনে। কারণ হতে পারে মানুষ তাদরে প্‌রবৃত্‌তি ও মনরে চাহদিা অনুযায়ী চলতে পছন্‌দ করে বসবে। ফলে অবধৈ ও নষিদ্‌ধি কাজে জড়য়িে পড়বে, পরস্‌পররে ওপর চড়াও হবে এবং তাদরে অধকিার হরণ করবে। সুতরাং এটা একটি পরপূির্‌ণ হকিমত যে, আল্‌লাহ তা‘আলা তাদরে মাঝে বভিন্‌িন সময়ে নবী ও রাসূল প্‌ররেণ করবনে, যারা তাদরেকে আল্‌লাহর আদশেসমূহ বর্‌ণনা করবনে। তারা পাপরে মাঝে পততি হওয়া থকেে সতর্‌ক করবনে, তাদরে প্‌রতি

ওয়াজ নসহিত করবনে এবং পূর্ববর্তী জাতসিমূহরে সংবাদ তাদরেকে জানাবনে। কারণ বস্মিয়কর সংবাদ যদি কানে আঘাত কর এবং অদ্ভুত অর্থ যদি মনকে সজাগ কর, তাহল বিবিকে-বুদ্ধি তা গ্রহণ কর, ফল তা তার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করব, বোধশক্তকি পরশিুদ্ধ করব। আর মানুষরে মধ্য অধকি শ্রবণকারী ব্যক্তহি অধকি অন্তঃকরণশীল হয়, আর অধকি অন্তঃকরণশীল অধকি চন্তিাশীল হয়, আর অধকি চন্তিাশীল অধকি জ্ঞানী, আর য অধকি জ্ঞানী স অধকি আমলকারী হয়। সুতরাং রাসূল প্ররেণ করার কোনো বকিল্প এবং তাদরে

থেকে অধিক হক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম আর কিছু পাওয়া যায় না।[৪৭]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ[৪৮] বলেন, ‘মানুষের ইহকাল ও পরকালে সংশোধনের জন্য রিসালাত অপরিহার্য। রিসালাতের অনুসরণ ছাড়া যেমন পরকালীন কল্যাণ নেই, অনুরূপ তার অনুসরণ ছাড়া পার্থিব জীবনেও কোনো মঙ্গল নেই। অতএব, মানুষ শরী‘আত অনুসরণ করতে বাধ্য। কারণ মানুষ সাধারণত দু’টি গতিবিধি বা নড়া-চড়ার মাঝে রয়েছে:

এক- যা তার কল্যাণ ও সফলতা বয়ে আনে।

দুই- যা তার নকিট থকেে ক্ষতকির বস্তুকে দূর করে।

আর শরী‘আত এমন এক আলোকবর্তকিা, যা মানুষরে জন্য কল্যাণকর এবং যা ক্ষতকির, উভয় দকি স্পষ্ট করে দয়ে। আর তা আল্লাহর যমীনে তাঁর জ্যোতি, বান্দাদরে মাঝে তাঁর ন্যায়বচিার এবং এমন এক দূর্গ, যে তাতে প্রবশে করবে সে নরিাপত্তা পাবে।

শরী‘আত দ্বারা কল্যাণকর ও ক্ষতকির বস্তুর মাঝে ইন্দ্রয়িগ্রাহ্য পার্থক্য করা উদ্দশ্যে নয়, এটা তো জীব-জন্তুরও অর্জতি হয়ে থাকে; কারণ গাধা এবং উটও গম আর মাটরি

মাঝে পার্থক্য করতে পারে। বরং শরী‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন সব কর্ম যা তার কর্তার ইহকাল ও পরকালে ক্ষতি করবে এবং এমন সব কর্ম যা তার কর্তার ইহকাল ও পরকালে উপকার দিবে সেটোর মাঝে পার্থক্য করে দেওয়া। উভয়কালীন কল্যাণকর বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, ঈমান আনয়ন, তাওহীদ (আল্লাহর এককত্বের স্বীকৃতি), ন্যায়পরায়ণতা, সদ্ব্যবহার, দয়া, আমানতদারিতা, ক্ষমা, বীরত্ব, জ্ঞানার্জন, ধৈর্যধারণ, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, প্রতিবেশীর প্রতি

ইহসান, অধিকার রক্ষা, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য আমল করা, তাঁর প্রতি ভরসা করা ও একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া, তার তাকদীর অনুযায়ী ঘটা বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, তাঁর হুকুম মান্য করা, তাঁকে এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদকে সত্যায়ণ করা এবং এ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেকে ঐ কাজ যা দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জন্য উপকারী। আর এর বিপরীতে যা দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জন্য দুঃখ ও অনিষ্টকর।

যদি (শরী‘আত) রিসালাত না থাকতো, তাহলে বুদ্ধি-বিবেকে পার্থিব জীবনের কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। সুতরাং বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নি'আমত ও দয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে সঠিক পথ বর্ণনা করেছেন। যদি এটা না হতো তবে তারা পশুর পর্যায়ে যেত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিপতিত হত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত রিসালাতকে গ্রহণ করল এবং তার ওপর অবিচল থাকল সেই সৃষ্টির সেরা। পক্ষান্তরে যে তা পরিত্যাগ করল ও তা হতে বের হয়ে গেল, সে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম সত্তা, সে কুকুর ও শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট বরং প্রত্যেক হীন ও

নীচ থেকেও অতি নীচ। পৃথিবীবাসীর জন্য তাদের মাঝে বিদ্যমান রিসালাতের অনুসরণ ছাড়া আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও অসম্ভব। তাই যখনই পৃথিবী থেকে রাসূলগণের পদাঙ্কানুসরণ ও তাদের হিদায়াতের চিহ্ন মুছে যাবে, তখনই আল্লাহ তা‘আলা এর উপর-নিচ সব জগত ধ্বংস করে দিবেন এবং কিয়ামত ঘটাবেন।

রাসূলদের প্রতি পৃথিবীবাসীর মুখাপেক্ষিতা, চন্দ্র, সূর্য, বাতাস ও বৃষ্টির প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতার মতো নয় (বরং আরও অনেক বেশি মুখাপেক্ষী)। এমনকি (রাসূলদের প্রতি তাদের যত মুখাপেক্ষিতার রয়েছে)

মানুষ তার জীবনের প্রতি, চোখ তার জ্যোতির প্রতি এবং দেহ খাদ্য ও পানির প্রতিও এতটুকু মুখাপেক্ষী নয়। বরং এগুলোর চেয়ে আরও বেশি মুখাপেক্ষী এবং সে যা অনুমান করে ও তার মনে মনে ভাবে তার চাইতেও বেশি প্রয়োজন। রাসূলগণই আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম। তারাই আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূতস্বরূপ। তাদের সর্বশেষ ও সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম; যাকে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ এবং তাঁর পথে বিচরণকারী ও সকল সৃষ্টজীবের ওপর

প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। বান্দাদের ওপর তার আনুগত্য করা, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর সম্মান করা, তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর যথাযথ হক আদায় করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস আনা ও তাঁর আনুগত্য করার ব্যাপারে তিনি সমস্ত নবী ও রাসূলগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর তিনি তাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারাও যেন তাদের মুমিন অনুসারীদের নিকট হতে তার ওপর ঈমানের অঙ্গীকার নেন। কিয়ামতের আগে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে

আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেন। ফলে তার মাধ্যমেই রিসালাতের পরিসমাপ্তি করেন। তাঁর মাধ্যমে লোকদেরকে পথভ্রষ্টতা হতে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, অজ্ঞতা হতে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর রিসালাতের দ্বারা অন্ধের চোখ, বধিরের কান ও বদ্ধ অন্তর খুলে দিয়েছেন। অন্ধকার পৃথিবী তাঁর রিসালাতের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে, শতধা বিভক্ত অন্তরসমূহ একত্রিত হয়েছে, তাঁর দ্বারা বাঁকা জাতিকে ঠিক করা হয়েছে, উজ্জ্বল পথ স্পষ্ট করা হয়েছে, কল্যাণের জন্য তাঁর বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তাঁর ওপর থেকে ভারী

বোঝা অপসরণ করছেনে এবং তাঁর খ্যাতকিে উচ্চ মর্যাদা দান করছেনে। পক্ষান্তরে যে তার আদশে অমান্য করবে তার জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান নরি্ধারণ করছেনে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এমন এক সময় প্ররেণ করনে, যখন নবী ও রাসূলগণরে আগমনরে দীর্ঘ বরিতকিাল চলছলি, আসমানী কতিাবসমূহ নশি্চহি্ন হয়ে পড়ছেলি, আল্লাহর বাণী ও শরী‘আতরে পরবির্তন ও পরবির্ধন করা হয়ছেলি, প্রত্যকে জাতি তাদরে অন্যায় সদি্ধান্তরে ওপর নরি্ভর করছলি, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদরে ওপর তাদরে প্রবৃত্তি ও বাতলি উক্তি দ্বারা ফায়সালা করছলি। এমতাবস্থায়

আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে হিদায়াত করলেন ও সঠিক পথ দেখালেন, মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসলেন, সৎ ও অসৎ ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করে দিলেন। ফলে যে তাঁর পথ অবলম্বন করল, সে সঠিক পথ পেল, আর যে তাঁর পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল, সে পথভ্রষ্ট হলো ও সীমালঙ্ঘন করল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ওপর এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণের ওপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।[৪৯]

রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা:

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে রিসালাতের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো:

(১) নিশ্চয় মানুষ সৃষ্ট ও পালিত জীব। তার ওপর সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানা আবশ্যক এবং তার জানা উচিত যে, মহান স্রষ্টা তার কাছ থেকে কী চান? কেন তাকে সৃষ্টি করেছেন? এগুলো জানার ক্ষেত্রে মানুষ স্বনির্ভর হতে পারে না। আর নবী ও রাসূলগণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তারা যে হিদায়াতের নূর নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জানা ব্যতীত তা জানার কোনো পথ নেই।

(২) মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। শরীরের খাবার হচ্ছে যথাসম্ভব খাদ্য ও পানীয়। আর আত্মার খোরাক হলো তার সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করা। এটাই হচ্ছে সঠিক দীন ও সৎ আমল। আর নবী ও রাসূলগণ তো সঠিক দীন নিয়ে এসেছেন এবং সৎ কাজের শিক্ষা দিয়েছেন।

(৩) মানুষের স্বভাবেই ধর্ম মানার বিষয়টি নিহিত রয়েছে। তাকে কোনো না কোনো ধর্মে দীক্ষিত হতে হবেই। যে দীন সে গ্রহণ করবে সেটি সঠিক হওয়া আবশ্যক। আর সঠিক ধর্ম পেতে হলে নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি

ঈমান আনা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

(৪) দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখেরাতে জান্নাত ও তার নি'আমত লাভের পথ ও পদ্ধতি জানার মুখাপেক্ষী। আর সে পথ নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ দেখাতে পারবে না, প্রদর্শন করাতেও পারবে না।

(৫) মানুষ নিজে অত্যন্ত দুর্বল এবং অসংখ্য শত্রুবেষ্টিত। যেমন- শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, দুষ্ট বন্ধু তার জন্য ঘৃণ্যতম পথকে সুশোভিত করতে চায়, অসৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী আত্মা তাকে অসৎ পরামর্শ দেয়। যার কারণে তার এমন

কিছুর প্রয়োজন যা তাকে এ ধরনের শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে। আর নবী ও রাসূলগণ সেই পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করে গেছেন।

(৬) মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। ফলে অন্য মানুষের সাথে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা ও চলাফেরার জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো শরী‘আত তথা নিয়মনীতি বা বিধানের প্রয়োজন রয়েছে; যাতে করে মানুষ ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। নতুবা তাদের জীবন বন্য জীবনের মতো হয়ে পড়বে। সেই শরী‘আত বা বিধানটি যেন অবশ্যই কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা

প্রদর্শন না করে সবার অধিকার রক্ষা করে এমন হয়। আর এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত কেউ আনতে পারে না।

(৭) মানুষ ঐ জিনিস জানার প্রতি মুখাপেক্ষী; যা তার আত্ম-প্রশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং বাস্তব সফলতার কারণ শিক্ষা দেয়। আর নবী ও রাসূলগণ তো এদিকেই আহ্বান করে থাকেন।

নবী রাসূলগণের প্রতি সৃষ্টিকুলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার পর আখেরাত বা পরকাল সম্পর্কে দলীল প্রমাণাদি সহ আলোচনা করা উত্তম মনে করছি।

পরকাল বা আখিরাত

প্রত্যেকে মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সে অবশ্যই মারা যাবে, আর এটা সুনিশ্চিত! কিন্তু মৃত্যুর পরে তার ঠিকানা কোথায় হবে? সে কি সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান?

বহু জাতি ও জনগোষ্ঠী বিশ্বাস পোষণ করে যে, মরণের পরে তাদেরকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের সকল কর্মের হিসাব নেয়া হবে। কর্ম যদি ভালো হয় তবে তার প্রতিদানও ভালো হবে, আর কর্ম যদি খারাপ হয় তবে তার প্রতিদানও খারাপ হবে।[৫০]

এ বিষয়টিকে অর্থাৎ পুনরুত্থান ও হিসাবকে সুস্থ বিবেকে মেনে নেয় এবং শরী‘আতে ইলাহী তথা আল্লাহর বিধান তাকে সেটা বিশ্বাস করতে সহায়তা করে। এর ভিত্তি তিনটি মূলনীতির উপর:—

(১) মহান আল্লাহর জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতা প্রমাণ করা।

(২) মহান আল্লাহর ক্ষমতার পরিপূর্ণতা প্রমাণ করা।

(৩) এবং তাঁর হিকমতের পরিপূর্ণতা প্রমাণ করা।[৫১]

একে প্রমাণ করার জন্য উক্তি ও যুক্তি ভিত্তিক (নাক্বলী ও আকলী)

অনেক দলীলের সমাবেশ ঘটেছে। কিছু দলীল নিম্নে পেশ করা হলো:

(১) ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি দ্বারা মৃতকে জীবিত করার প্রমাণ গ্রহণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰۚ بَلَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٣٣﴾ [الاحقاف: ٣٣]

“তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। হ্যাঁ, অবশ্যই! নিশ্চয় তিনি প্রত্যেকে

জিনিসের ওপর সর্বশক্তিমান।” [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ৩৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿أَوَ لَيۡسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّٰقُ ٱلۡعَلِيمُ ٨١﴾ [يس: ٨١]

“যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি মহা-স্রষ্টা, সর্বজ্ঞাত।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮১]

(২) পূর্ববর্তী কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়াই তাঁর মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা, দ্বিতীয়বার তাদের পুনরাবৃত্তি

ঘটানোর ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার দলীল গ্রহণ। প্রথম অস্তিত্বে আনতে যিনি ক্ষমতাবান, পুনর্বার আনয়ন করতে তিনি তো আরও বেশি সক্ষম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٧﴾ [الروم: ٢٧]

“আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ গুণাগুন তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلٗا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ ٧٨ قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ ٧٩﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]

“আর সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, ‘কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে’? বলুন, ‘তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত’।”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৭৮-৭৯]

(৩) এই পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সর্বোত্তম

অবয়বে মানুষ সৃষ্টি এবং এর গঠনে যেসব গোশত, হাড্ডি, শিরা, স্নায়ু, ছিদ্র বা ফাঁকা, যন্ত্র, জ্ঞান, পরিচালনা ও দক্ষতাসমূহ ইত্যাদি আছে, এগুলোর মাঝে মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার বিরাট প্রমাণ রয়েছে।

(৪) ইহ জগতে মৃতকে জীবিত করা দ্বারা আখেরাতে মৃতকে জীবিত করার ওপর আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ দেয়া। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে সংবাদ যেমন- ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এবং ‘ঈসা মাসীহ

‘আলাইহিস সালামের হাতে আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করার ঘটনা। এগুলো ছাড়া আরও অনেক রয়েছে।

(৫) হাশর-পুনরুত্থানের অনুরূপ কিছু বিষয়ের ওপর তাঁর ক্ষমতা দ্বারা মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ। যেমন-

ক- আল্লাহ মানুষকে বীর্যের ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ছিল, যার কারণে সঙ্গমের সময় সারা শরীরে মজা লাভ করে, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এই বীর্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে একত্রিত করেন, অতঃপর তা বের হয়ে স্থাপিত হয় মাতৃগর্ভের মজবুত

এক নবিাসে, তারপর সখোনে আল্লাহ তা‘আলা তা হতে মানুষ সৃষ্টি করনে। সুতরাং এই বীর্য যখন বচ্ছিন্ন অবস্থায় ছলি, তখন তনিি ওকে একত্রতি করে তা হতে এই মানুষ সৃষ্টি করনে, তারপর মৃত্যু বরণ করার ফলে, দ্বতিীয়বার যখন আবার তা বচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সটোকে পুনরায় একত্রতি করতে বাধা কোথায়? মহা প্রশংসতি আল্লাহ বলনে,

﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تُمۡنُونَ ٥٨ ءَأَنتُمۡ تَخۡلُقُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٥٩﴾ [الواقعة: ٥٨، ٥٩]

“তোমরা কি ভবেে দখেছে তোমাদরে বীর্যপাত সম্বন্ধে? ওটা কি তোমরা

সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি।” [সূরা আল-ওয়াক্বিআহ, আয়াত: ৫৮-৫৯]

খ- বিভিন্ন প্রকার আকার-আকৃতির শস্যবীজ যদি সিক্ত বা ভেজা যমীনে পড়ে এবং তাকে মাটি ও পানি ঢেকে ফেলে, তাহলে আপাতত বিবেকের দাবী যে, ওগুলো পঁচে ও নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ মাটি ও পানির যেকোনো একটিই নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, অতএব দু’টি জিনিস একত্রিত হলে তো নষ্টের জন্য আরও বেশি সহজ! কিন্তু তা নষ্ট না হয়ে বরং সংরক্ষিত অবস্থায় টিকে থাকে। অতঃপর যখন সিক্ততা আরও বেড়ে যায়, তখন শস্যবীজ ফেটে চারা গজায়। এগুলো কি

পরিপূর্ণ শক্তি ও ব্যাপক হিকমতের প্রমাণ বহন করে না? সুতরাং এই ক্ষমতাবান ও মহা প্রজ্ঞাবান রব, বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরোকে একত্রিত করতে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জোড়া দিতে কীভাবে অক্ষম হবেন? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ ٦٣ ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ٦٤﴾ [الواقعة: ٦٣، ٦٤]

“তোমরা যে বীজ বপন কর সে বিষয়ে চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি সেটাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি।” [সূরা আল-ওয়াক্বিআহ, আয়াত: ৬৩-৬৪] এর অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥﴾ [الحج: ٥]

“আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৫]

(৬) মহান সৃষ্টিকর্তা, যিনি শক্তিশালী, সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাবান তিনি মানুষকে অযথা সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে নিরর্থক ছেড়ে দিবেন এ দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧﴾ [ص : ٢٧]

“আমি আসমানসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মাঝে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফেরদের ধারণা তাই, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৭]

বরং তিনি মানুষকে মহান এক হিকমত ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি জিন্ন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

সুতরাং এই মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, যারা তাঁর আনুগত্য করবে এবং যারা তাঁর নাফরমানী করবে তারা সবাই তাঁর কাছে সমান! আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ ٢٨﴾ [ص : ٢٨]

“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে কি আমরা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করবো?

আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৮]

সে কারণে তাঁর হিকমতের পূর্ণতা এবং প্রবল শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব হলো যে, তিনি কিয়ামত দিবসে সকল মানুষকে তাদের কর্মের প্রতিদান দেয়ার জন্য তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। ফলে নেককারকে সওয়াব আর পাপীকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقًّاۚ إِنَّهُۥ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٞ مِّنۡ حَمِيمٖ وَعَذَابٌ أَلِيمُۢ﴾ [يونس : ٤]

“তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের ফিরে যাওয়া; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের জন্য। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪][৫২]

কিয়ামত দিবস বিশ্বাস করার উপকারিতা:

কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করার অনেক উপকারিতা ব্যক্তি ও সমাজের ওপর

রয়েছে, এর কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১- ঐ দিনে সাওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হবে এবং শাস্তির ভয়ে তারা নাফরমানী করা হতে দূরে থাকবে।

২- আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার মধ্যে মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে; কারণ পার্থিব দুনিয়ার যেসব কল্যাণ তার ছুটে গেছে তার পরিবর্তে সে আখেরাতের কল্যাণ ও তার সাওয়াব আশা করবে।

৩- আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার ফলে মৃত্যুর পরে কোথায় তার ঠিকানা হবে

এবং সে তার কর্মের প্রতিফল পাবে, মানুষ তা জানতে পারে। কর্ম যদি ভালো হয় তবে তার প্রতিদানও ভালো হবে, আর কর্ম যদি খারাপ হয় তবে তার প্রতিদানও খারাপ হবে। আরও জানতে পারে যে, হিসাব নিকাশের জন্য (আল্লাহর সামনে) তাকে দাঁড় করানো হবে, যাদের ওপর সে যুলুম করেছে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং যাদের প্রতি সে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছে তাদের জন্য তার নিকট হতে বান্দার হক আদায় করা হবে।

(৪) আখেরাতের প্রতি ঈমান স্থাপন অপরের প্রতি যুলুম এবং তাদের হক নষ্ট করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে।

সুতরাং মানুষ যদি আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তবে তারা পরস্পরে যুলুম থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের হকসমূহও রক্ষা পাবে।

(৫) আখিরাতের প্রতি ঈমান স্থাপন মানুষকে এমন করে দেয় যে, সে মনে করে দুনিয়ার ঘর সংসার জীবনের একটি স্তর মাত্র। এটাই পুরো জীবন নয়।

এই অনুচ্ছেদের শেষে সঙ্গত মনে করছি যে, আমেরিকান নাগরিক ওয়াইন বটে নামক এক খ্রিষ্টানের একটি উক্তিকে প্রমাণ-সরূপ পেশ করি। সে এক গির্জায় কাজ করতো, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখার ফলাফল উপলব্ধি

করে। তিনি বলেন, আমি এখন এমন ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানি যা আমার জীবনকে খুব ব্যস্ত করে রেখেছিল। প্রশ্ন ৪টি হলো: আমি কে? আমি কি চাই? আমি কেন এসেছি? আমার গন্তব্য কোথায়?।[৫৩]

রাসূলগণের দা‘ওয়াতের মূলনীতি

সমস্ত নবী ও রাসূল সম্মিলিত কতিপয় মৌলিক নীতিমালার প্রতি আহ্বানের ব্যাপারে একমত হয়েছেন।[৫৪] যেমন- আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং তকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। তেমনি একমাত্র

আল্লাহর ইবাদাতরে আদশে করা, যার কোনো অংশীদার নইে। আর তাঁর পথ অনুসরণ করা এবং অন্য পথসমূহরে অনুসরণ না করা। চার প্রকার জনিসিকে হারাম করা, যথা: প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল প্রকার অশ্লীলতা ও গুনাহ, অন্যায়ভাবে যুলুম করা, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন এবং প্রতমিা ও মূর্তপিূজা করা। আর আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার, সমকক্ষ ও সাদৃশ্য আছে ইত্যাদি থকেে এবং তাঁর বরিুদ্ধে অসত্য বলা থকেে তাঁকে পবত্রি করা। তমেনি সন্তানাদি ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে হারাম মনে নওেয়া। সুদ ও ইয়াতমিরে সম্পদ ভক্ষণ করা হতে নষিদ্ধি করা।

অঙ্গীকারসমূহ, পরিমাপ ও ওজন পূর্ণভাবে প্রদান করা, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং কথা ও কাজে সততা অবলম্বনের আদেশ করা। অনুরূপভাবে অপচয় ও অহংকার করা হতে এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম[৫৫] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “মৌলিক বিষয়সমূহে সকল শরী‘আত এক ও অভিন্ন, যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন শরী‘আত হিসেবে পরিগণিত। যার সৌন্দর্য অন্তরের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যদি তা যার ওপর

প্রতিষ্ঠিত, তা ব্যতীত অন্য কিছু হয়ে যায় তবে তা হিকমাত, কল্যাণ ও রহমত হতে বেরিয়ে যাবে। বরং শরী‘আত যা নিয়ে এসেছে তার বিপরীতে তা আসবে এটা অসম্ভব।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ﴾ [المؤمنون : ٧١]

“সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৭১]

আর বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এটা কীভাবে মেনে নিতে পারে যে, মহা প্রশাসক (আল্লাহ) কর্তৃক প্রদত্ত শরী‘আতে যা এসেছে তা বাদ দিয়ে সেটার বিপরীত জিনিস নিয়ে আসবে?[৫৬]

আর এ কারণেই সকল নবীগণের দীন ছিল এক ও অভিন্ন, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ٥٢﴾ [المؤمنون : ٥١، ٥٢]

“হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি পূর্ণ

অবগত। আর তোমাদের এই জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব; অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর”। [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৫১, ৫২] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: ١٣]

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবিদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমরা অহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং

তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩]

বরং দীনের উদ্দেশ্য হলো: বান্দাগণ যেন যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে পৌঁছে যায়। আর তা হচ্ছে- একমাত্র তাদের রবের ইবাদাত করা, যার কোনো অংশীদার নেই[৫৭]। সুতরাং দীন তাদের ওপর এমন কিছু কর্তব্য বিধিবিদ্ধ করে দেয় যা তাকে পালন করতেই হবে, আর তাদের জন্যও কিছু কর্তব্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে, আবার তাদেরকে এমন সব মাধ্যম দিয়েও সাহায্য করে, যা তাদেরকে এই লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। যাতে করে আল্লাহর পন্থা মোতাবেক তাদের

জন্য তাঁর সন্তুষ্টি ও উভয় জগতরে কল্যাণ বাস্তবায়ন হয়, যা বান্দাকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্নি ভিন্নি করবে না এবং এমন কঠিনি কষ্টকর রোগ দ্বারা তার ব্যক্তিত্বি আঘাত করবে না, যা তাকে তার স্বভাব, তার আত্মা এবং তার চতুঃপার্শ্বরে জগতরে মাঝে সংঘাত লাগিয়ে দিবি।

সুতরাং রাসূলগণ আল্লাহর এমন এক দীনরে দিকে আহ্বান করনে, যা মানবজাতরি সামনে উদ্দশ্যে আকীদাহ-বিশ্বাসরে মূল বুনয়িাদ পশে করে, যার প্রতি তাকে বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে হয় এবং এমন এক শরী‘আত পশে করে, যার ওপর তাকে সারা জীবন

চলতে হয়। সেজন্য তাওরাতে আকীদাহ ও শরী‘আহ ছিল এবং তার অনুসারীদেরকে এর মাধ্যমে মীমাংসা নিষ্পত্তির চাপ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ ٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]

“নিশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে হিদায়াত ও আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নবীগণ তা অনুযায়ী ইয়াহূদীদেরকে আদেশ করতেন, আর আল্লাহ ওয়ালাগণ এবং আলেমগণও।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 44]

অতঃপর ‘ঈসা মাসীহ ‘আলাইহিস সালাম ইঞ্জিল নিয়ে আসেন, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো আর তার পূর্বে যে তাওরাত ছিল তার সত্যায়নকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٤٦﴾ [المائدة: ٤٦]

“আর আমরা তাদের পর ‘ঈসা ইবন মারইয়ামকে এ অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে, সে তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন এবং আমরা তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত

এবং আলো ছিল।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৬]

অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষে পূর্ণ শরী‘আত ও পূর্ণাঙ্গ দীন নিয়ে আগমন করেন, যা পূর্ববর্তী সকল শরী‘আতের তত্ত্বাবধায়ক এবং রহিতকারী। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে আল-কুরআন দেন, যা তাঁর পূর্বের সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ ٤٨﴾

[المائدة: ٤٨]

“আর আমরা এ কিতাব (কুরআন) কে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি হককের সাথে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষকও; অতএব আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না।” [সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৪৮]

আর আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে মুমিনগণও এর প্রতি ঈমান রাখে, যেমন তাঁর পূর্বেকার সকল নবী ও রাসূলগণ এর

প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥]

“রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে: আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে

আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫]

চিরস্থায়ী রিসালাত[৫৮]

ইতোপূর্বে ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক, যরথুস্ত্র ও পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ধর্মসমূহের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তাতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানবজাতির অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায়। (অত্র কিতাবের “বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা” দ্রষ্টব্য)

কনেনা যখনই দীন বনিষ্‌ট হবে তখনই রাজনতৈকি, সামাজকি ও অর্‌থনতৈকি অবস্‌থারও ধ্‌বংস অনবিার্‌য। ফলে রক্‌তক্‌ষয়ী যুদ্‌ধ ব্‌যাপকতা লাভ করে। স্‌বচে্‌ছারতিা প্‌রকাশ পায়, আর মানবসমাজ সম্‌পূর্‌ণ কালো অন্‌ধকারাচ্‌ছন্‌ন পরবিশে বসবাস করতে থাকে। কুফর ও অজ্‌ঞতার কারণে অন্‌তরসমূহও অন্‌ধকারাচ্‌ছন্‌ন হয়ে পড়ে, চরত্‌রি কুলসতি হয়, মানহানি ঘটে, অধকিার লঙ্‌ঘতি হয়, জলে ও স্‌থলে বশি‌ৃঙ্‌খলা দখো দয়ে। এমনকি কোনো জ্‌ঞানী ব্‌যক্‌তি যদি সে অবস্‌থাকে নয়িে চনি্‌তা করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, সে সময় মানবজাতি মৃত্‌যুর সন্‌ধক্‌ষিণে অবস্‌থান করছলি

এবং তাদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এক মহান সংস্কারকের মাধ্যমে সংশোধন করার ইচ্ছা করলেন, যিনি নবুওয়াতের মশাল ও হিদায়াতের চেরাগ বহন করবেন; যাতে করে তিনি মানবজাতির পথকে আলোকিত করতে পারেন এবং তাদেরকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন। এমন সময়েই আল্লাহ তা‘আলা মক্কা মুকাররমা থেকে চিরন্তন নবুওয়াতের জ্যোতি উদ্ভাসিত করার ঘোষণা করলেন, যেখানে রয়েছে সম্মানিত কা‘বা ঘর। আর তখনকার পরিবেশ মানবজাতির অন্য সব পরিবেশের সাথে যেমন- শির্ক, মূর্খতা, যুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির দিক

থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার পরেও অন্যদের থেকে তা ছিল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন,

(১) এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছ। গ্রীক, রুমানীয় বা ভারতীয় দর্শনের কালিমার প্রভাব এর ওপর বিস্তার লাভ করেনি। প্রত্যেক ব্যক্তিই বাকপটুতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও অভিনব স্বভাবের অধিকারী ছিল।

(২) এটা বিশ্বের কেন্দ্রে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এ সমস্ত অঞ্চলে এই চিরন্তন সত্য বাণী পৌঁছার ও দ্রুত বিস্তার লাভ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(৩) এটা একটা নিরাপদ এলাকা। আবরাহা যখন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে, তখন আল্লাহ নিজেই এটাকে রক্ষা করেন এবং এর প্রতিবেশী রোম ও পারস্যের সম্রাটরাও এর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি। বরং উত্তর দক্ষিণাঞ্চলেও এর ব্যবসা নিরাপদ ছিল। এ সবই ছিল এই সম্মানিত নবীর আগমনের লক্ষণ মাত্র। আল্লাহ তা‘আলা এই নি‘আমত প্রাপ্তদের উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَ لَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ [القصص: ٥٧]

“আর তারা বলে, ‘আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।’ আমরা কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়।” [সূরা কাসাস, আয়াত: ৫৭]

(৪) এই অঞ্চলটি মরুময় পরিবেশযুক্ত, যা এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন প্রশংসামূলক গুণের অধিকারী করেছিল। যেমন: দানশীলতা, প্রতিবেশীত্ব রক্ষা, আত্মসম্মানবোধ ইত্যাদি অনন্য বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছিল, যাতে এই স্থানটিই চিরন্তন রিসালাতের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। এই মহান স্থান (যারা

বাগ্মিতা ও অলংকারশাস্ত্র এবং উত্তম চরিত্রের কারণে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং যাদের বিশেষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ছিল সেই বিখ্যাত কুরাইশ গোত্র হতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্বাচিত করেন, যাতে করে তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূলের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তাঁর পিতা মারা যাওয়ায় ইয়াতীম হিসেবেই বড় হতে থাকেন। তারপর ছয় বছর বয়সে তাঁর মা ও দাদা উভয়েই মারা যান। পরে তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব নেন। শৈশবেই তাঁর

প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাঁর অভ্যাস, চরিত্র ও স্বভাব সবই যেন স্বজাতির অভ্যাসের চেয়ে ভিন্ন ছিল। মিথ্যা কথাবার্তা বলতেন না, কাউকে কষ্ট দিতেন না। সত্যবাদিতা, সংযমশীলতা ও আমানতদারিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে তাঁর গোত্রের অনেক মানুষই তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদ আমানত ও জমা রাখত। আর তিনিও সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন যেমন তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর সম্পত্তির সংরক্ষণ করতেন। যার কারণে তারা তাকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি খুব লাজুক ছিলেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হতে কারও সামনে তিনি

তাঁর উদাম শরীর প্রকাশ করেননা। নিষ্কলুষ ও পরহেযগার হওয়ার কারণে তিনি তাঁর স্বজাতির মধ্যে মূর্তিপূজা, মদপান ও খুনাখুনি দেখে ব্যথিত হতেন। যে সকল কাজ তার কাছে ভালো মনে হত সেগুলোতে তিনি সহযোগিতা করতেন আর অন্যায়মূলক কাজে তাদের থেকে দূরে থাকতেন। ইয়াতীম ও বিধবাদের সাহায্য করতেন। ক্ষুধার্তকে খাবার দিতেন। অবশেষে যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তখন সমাজের ফিতনা-ফ্যাসাদ ও ভ্রান্তির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, লোকালয় মুক্ত পরিবেশে একাকী তাঁর রবের ইবাদাতে মনোযোগ দেন এবং তাঁর কাছে সঠিক পথের সন্ধান চান।

এ রকম অবস্থাতেই একদিন তাঁর কাছে একজন ফিরিশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী বাণী নিয়ে অবতরণ করেন। আর তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এই দীনকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আর তাদেরকে তাদের প্রভুর ইবাদাত করার এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের বর্জন করার আহ্বান করেন। এভাবেই দিনের পর দিন ও বছরের পর বছর শরী‘আতের হুকুম আহকাম নিয়ে অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির জন্য এই দীনকে পরিপূর্ণ করেন এবং তাতে তার নি‘আমতকে পূর্ণাঙ্গ করেন। এরপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব পূর্ণ হলে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু

দান করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত পূর্ব জীবন এবং নবী ও রাসূল হিসেবে ২৩ বছর অতিবাহিত করেন।

যে কেউ নবীগণের অবস্থাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং তাদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবে সে নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যে, অন্যান্য নবীদের নবুওয়াত যে পদ্ধতিতেই সাব্যস্ত করা যায়, ঠিক একই পদ্ধতিতে আরও উত্তমরূপে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সাব্যস্ত করা যায়।

আপনি যদি লক্ষ্য করেন, মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়াত কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে জানতে পারবেন যে, তা “মুতাওয়াতির” বা সন্দেহমুক্ত অসংখ্য ধারাবাহিক বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতও “মুতাওয়াতির” বা সন্দেহমুক্ত আরও বৃহৎ, অধিক নির্ভরযোগ্য ও অধিক নিকটবর্তী মাধ্যম দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

অনুরূপভাবে নবীগণের মু‘জিযা ও নিদর্শনসমূহ যে সন্দেহমুক্ত অসংখ্য ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে তা

পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে আরও বড় আকারে সাব্যস্ত হবে। কারণ তাঁর নিদর্শনসমূহ অনেক। বরং তাঁর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে- এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা লেখা ও শোনা উভয় দিক হতে ‘মুতাওয়াতির’ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসছে।[৫৯]

আর যদি কেউ মূসা ও ‘ঈসা আলাইহিমাস সালাম যা নিয়ে এসেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সঠিক আকীদাহ ও যথাযথ বিধিবিধানসমূহ এবং উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এসেছেন -এ দুটি

জনিসিরে মাঝে তুলনামূলক বশি্লষেণ করে, তাহলে সে অবশ্যই জানতে পারবে যে, এসবই এক প্রদীপ থকেইে আগত। আর তা নবুওয়াতরে প্রদীপ।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নবীগণরে অনুসারী ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসারীর মাঝে তুলনা করবে, জানতে পারবে যে, তারা মানুষরে উপকার করার ক্ষত্রেে উত্তম মানুষ ছলিনে। বরং তারা নবীদরে পদাঙ্ক অনুসরণে তাদরে পরবর্তীদরে তুলনায় অধকি অগ্রগামী ছলিনে। কারণ তারাই তাওহীদরে প্রচার করছেনে, ন্যায়পরায়নতার বস্তিার ঘটয়িছেনে

এবং তারা দুর্বল ও দরিদ্রদের ওপর দয়াশীল ছিলেন।[৬০]

আপনি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা জানতে চান, তাহলে আমি আপনার সামনে ঐ সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করবো, যা আলী ইবন রাব্বান আত-ত্বাবারী খৃষ্টান থাকা অবস্থায় পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একারণেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দলীল প্রমাণাদি নিম্নরূপ:

১। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য নবীদের মতো শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত

করতে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২। তিনি এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি যাহির করেন, যা নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ নিয়ে আসতে পারে না।

৩। তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে যেসব খবর দিয়েছেন, সেগুলো আজ হুবহু সংঘটিত হচ্ছে।

৪। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার রাজত্ব সংক্রান্ত কিছু ঘটনাগুচ্ছের সংবাদ দিয়েছেন, তা হুবহু সংঘটিত হচ্ছে যেমন তিনি সংবাদ দেন।

৫। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে প্রেরিত হন তা নবুওয়াতের একটি বড় নিদর্শন। কারণ তা হচ্ছে একটি পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ তা‘আলা তা এমন এক নিরক্ষর ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ করেন, যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না। অথচ তিনি বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতদেরকে কুরআনের অনুরূপ অথবা কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। (কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তা সক্ষম হয়নি, আর কোনো দিন হবেও না) আরও কারণ হচ্ছে- স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তার হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তার

মাধ্যমে সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাসের সংরক্ষণ করেন এবং তাতে পূর্ণাঙ্গ শরী‘আত অন্তর্ভুক্ত করেন ও তার মাধ্যমে সর্বোত্তম জাতি প্রতিষ্ঠা করেন।

৬। তিনি হলেন নবীগণের সমাপ্তকারী, ফলে তিনি প্রেরিত না হলে ঐ সমস্ত নবীগণের নবুওয়াত বাতিল হয়ে যেত যারা তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

৭। সমস্ত নবীগণ দীর্ঘ যুগ ধরে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বাভাস দেন এবং তাঁর আগমন, তাঁর শহর, অনেক জাতি এবং শাসক গোষ্ঠীর তাঁর ও তাঁর উম্মতের বশ্যতা স্বীকার এবং তাঁর দীনের

বিস্তার লাভ ইত্যাদির গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

৮। যে সমস্ত জাতি তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে তাঁর বিজয় লাভ করাটাও নবুওয়াতের একটি লক্ষণ; কারণ একজন মানুষ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার হয়ে বলবে যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত, আর আল্লাহ তাকে বিজয় ও প্রতিষ্ঠিতিকরণ, শত্রুর ওপর প্রাধান্য, দা'ওয়াতের প্রসার এবং অসংখ্য অনুসারী দিয়ে সাহায্য করবেন, এটা অসম্ভব। কেননা এসব একমাত্র সত্য নবীর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে।

৯। তাঁর মাঝে যে দীনদারিতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যবাদীতা, প্রশংসনীয় চরিত্র এবং নিয়ম-নীতি ও শরী‘আত পালনের গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল, তা সত্য নবী ছাড়া আর কারো মাঝে একত্রিত হয় না।

অতঃপর তিনি এই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন করার পর বলেন: এগুলো হলো স্পষ্ট গুণাবলি ও যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদি। সুতরাং যে ব্যক্তির মাঝে এগুলো প্রকাশ পায়, তার জন্য নবুওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়, তার মিশন ও দাবী সফল হয় এবং তাঁকে বিশ্বাস করা অপরিহার্য হয়। আর যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করল,

তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ধ্বংস হলো।[৬১]

অবশেষে আপনার উদ্দেশ্যে দু’টি সাক্ষ্য বর্ণনা করে এই অনুচ্ছেদের ইতি টানবো: একটি হচ্ছে অতীতের সেই রোম সম্রাটের সাক্ষ্য যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক ছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জন সেন্ট নামক সাম্প্রতিক কালের এক ইংরেজ খ্রীষ্টানের সাক্ষ্য:

প্রথমত: রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাক্ষ্য। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আবু সুফিয়ানের ঐ সংবাদ বর্ণনা করেন

যখন তাকে রোমের বাদশাহ ডেকে জিজ্ঞেসে করে। এ প্রসঙ্গে (বাদশাহ ও তার মাঝে) যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল তার বিবরণ তিনি (ইমাম বুখারী) ইবন ‘আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তিনি বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান ইবন হারব তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে একটি কুরাইশ দলের সঙ্গে ডেকে পাঠান। এই দলটি হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির আওতায় নিরাপত্তা লাভ হেতু শামদেশে গিয়েছিল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে।[৬২] তারা সবাই ঈলিয়া নামক স্থানে (শামদেশে) তার নিকট উপস্থিত হলেন। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে তার দরবারে আহ্বান করলেন। ঐ সময় তার পাশে রোমের

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি তার দোভাষীর মাধ্যমে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে করে বললেন: যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন তাঁর সঙ্গে আপনাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ? আবু সুফিয়ানের বর্ণনা যে, আমি বললাম: আমি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। হিরাক্লিয়াস বললেন: তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকেও তার পিছনে বসাও। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন: তুমি তাদেরকে বলো যে, আমি এই ব্যক্তিকে উক্ত নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ফলে সে যদি আমাকে মিথ্যা বলে তবে তারাও যেন তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ

করে। আবু সুফিয়ান বলল: আল্লাহর কসম! মিথ্যা বলার কারণে আমাকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করার ভয় যদি না থাকত তবে অবশ্যই আমি তাঁর (নবী) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। এরপর তাঁর সম্পর্কে হিরাক্লিয়াস আমাকে প্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ কেমন? আমি বললাম: তিনি উচ্চ বংশোদ্ভূত। হিরাক্লিয়াস বললেন: এমন কথা তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল? আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস বললেন: তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিল? আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস বললেন: আচ্ছা তবে সম্মানিত লোকজন তাঁর

অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকজন? আমি বললাম: বরং দুর্বল লোকজন। হিরাক্লিয়াস বললেন: এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে? আমি বললাম: কমছে না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিরাক্লিয়াস বললেন: এই দীন গ্রহণের পর কোনো ব্যক্তি কি দীনের প্রতি রাগ করে (বিদ্রোহী হয়ে) দীন ত্যাগ করেছে? আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস বললেন: তিনি যখন থেকে এসব কথা বলছেন তার পূর্বে কি তাঁকে তোমরা কোনো মিথ্যার সাথে জড়িত দেখেছ? আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস বললেন: তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি বললাম: না, তবে এখন আমরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছি।

জানি না এই ব্যাপারে তিনি এরপর কী করবেন। এই প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান বলেছেন যে, এই বাক্যটি ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর বিপক্ষে কিছু কথা প্রবেশ করানোর সুযোগ আমি পাইনি। হিরাক্লিয়াস বললেন: কোনো সময় তাঁর সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছো? আমি বললাম: হ্যাঁ। হিরাক্লিয়াস বললেন: তোমাদের এবং তাঁর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ ছিল? আমি বললাম: আমাদের ও তাঁর মাঝে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল বালতির ন্যায়; অর্থাৎ তিনি কখনো আমাদের পরাজিত করেছেন এবং আমরা কখনো তাঁকে পরাজিত করেছি। হিরাক্লিয়াস বললেন: তিনি তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ

প্রদান করেন? আমি বললাম: তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করতে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা বলতেন তা ছেড়ে দিতে, সালাত কায়েম করতে, সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীল আচরণ করতে এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন: তুমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) বল যে, আমি তোমাকে উক্ত নবীর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছিলে যে, তিনি হচ্ছেন তোমাদের মাঝে উচ্চ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। আর এমনই নবীগণ তাদের নিজ জাতির মধ্যে উচ্চ বংশীয়ই হয়ে থাকেন। আমি

জিজ্ঞেস করলাম যে (নবুওয়াতের) একথা তাঁর বলার পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল? তুমি উত্তর দিয়েছ ‘না’। আমি বলছি, এর পূর্বে অন্য কেউ যদি এ কথা বলে থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম যে, এই ব্যক্তি এমন এক কথার অনুকরণ করছে যা এর পূর্বে বলা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল। এর উত্তরে তুমি বলেছ ‘না’। ফলে আমি বলছি, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত, তাহলে বলতাম যে, এই ব্যক্তি তার পিতৃব্যের রাজত্ব দাবী করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইতোপূর্বে তাঁকে কি তোমরা মিথ্যুক

বলে দোষারোপ করছে? উত্তরে তুমি বলছে ‘না’। আমি ভালো করেই জানি, যে লোক মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার করে না সে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। আমি জিজ্ঞেসে করলাম যে, সম্মানিত লোকজন তাঁর অনুসরণ করছে নাকি দুর্বল লোকজন? উত্তরে তুমি বলছে: দুর্বল শ্রেণির লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণির লোকেরাই নবীগণের অনুসারী হন। আমি জিজ্ঞেসে করলাম যে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? উত্তরে তুমি বলছে: না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ঈমানের বিষয়টি এমনই, অবশেষে তা পরিপূর্ণ হয়। আমি জিজ্ঞেসে করলাম যে, এই দীনে প্রবেশে করার পর কি কেউ

বিরক্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে? উত্তরে তুমি বলেছে: না, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি হচ্ছে এই, দীনে প্রবেশকারী ব্যক্তির ঈমান যখন তার অন্তরের রূপালী পর্দার সাথে মিশে যায় তখন এরূপই হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? উত্তরে তুমি বলেছিলে: না, নবীদের ব্যাপার এরকমই হয়ে থাকে। তিনি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম: তিনি কিসের নির্দেশ প্রদান করেন? উত্তরে তুমি বলেছিলে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করতে বলছেন। অধিকন্তু তিনি তোমাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত

থাকতে, সালাত কায়েম করতে, সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীল আচরণ করতে নির্দেশ দেন। এখন কথা হচ্ছে, তুমি যা কিছু বলছ তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, তাহলে তিনি অতি শীঘ্রই আমার দুই পদতলের জায়গার অধিকার লাভ করবেন। আমরা জানি যে, তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবেন। যদি নিশ্চিত হতাম যে, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে সক্ষম হব, তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি তাঁর নিকটে থাকতাম তাহলে তাঁর পদদ্বয় ধৌত করে দিতাম। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের

পত্রখানা নিয়ে আসতে বললেন, যা তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিহিয়াহ ক্বালবীর মারফত বসরার প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি তাকে পত্রখানা দিলে হিরাক্লিয়াস তা পাঠ করেন। তাতে যা লেখা ছিল তা নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর প্রতি-

সেই ব্যক্তির ওপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক, যে হিদায়াতের অনুসরণ

করে চলবে। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে নিরাপদে থাকবেন ও আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। আর যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার প্রজাবৃন্দেরও[৬৩] পাপ আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক কথার দিকে আসুন যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান। আর তা হচ্ছে এই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করব না এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করব না, আর আমরা কেউই আল্লাহকে ছেড়ে একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। এতদসত্ত্বেও যদি মানুষেরা মুখ

ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম।[৬৪]

দ্বিতীয়ত: জন সেন্ট নামক সাম্প্রতিক কালের এক ইংরেজ খ্রিষ্টানের সাক্ষ্য:

তিনি বলেন, ‘ব্যক্তি ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাখ্যা ও তার মূলনীতি এবং সমতা ও তাওহীদের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ন্যায়বিচার সম্পর্কে অব্যাহতভাবে অবগত হওয়ার পর আমি আমার বিবেক ও আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে ইসলামে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ঐ দিন থেকে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি সকল ক্ষেত্রে ইসলামের

একজন আহ্বানকারী ও তাঁর হিদায়াতের সুসংবাদ-দানকারী হবো।

খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে গবেষণা ও তাকে নিয়ে গভীর চিন্তা করার পরই তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছেন। কারণ তিনি দেখতে পান, মানুষের জীবনে যে সমস্ত প্রশ্ন ঘুরপাক খায় তার অধিকাংশে সঠিক উত্তরই খ্রিষ্টধর্ম দিতে সক্ষম হয়না। ফলে তখন তার মধ্যে সন্দেহ অনুপ্রবেশ করে। তারপর তিনি কমিউনিজম বা সাম্যবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু তাতেও তিনি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পাননি। তারপর ইসলাম নিয়ে গবেষণা ও গভীর চিন্তা করেন (এবং তাতে তিনি

তার সার্বকি জীবনরে সকল প্রশ্নরে সমাধান পান) যার ফলে তনিি তাঁর প্রতি ঈমান আননে এবং সদেকি অন্যদরেকওে আহ্বান করনে।[৬৫]

খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতরে পরসিমাপ্তি

ইতোপূর্বরে আলোচনায় আপনার কাছে নবুওয়াতরে হাকীকত, তার নদির্শন ও আলামতসমূহ এবং আমাদরে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নবুওয়াতরে দলীল-প্রমাণসমূহ স্পষ্ট হয়ে গছে।ে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আপনার জানা প্রয়োজন য,ে নচিরে যকোনো একটি কারণে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কোনো রাসূল প্রেরণ করেন:

(১) নবীর রিসালাত কোনো একটি জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর এই নবীকে পার্শ্ববর্তী জাতির নিকট তাঁর রিসালাত প্রচার করার আদেশ দেয়া হয়নি। তখন আল্লাহ তা‘আলা আরেকজন রাসূলকে নির্দিষ্ট রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে ঐ জাতির কাছে প্রেরণ করেন।

(২) বা পূর্ববর্তী নবীর রিসালাত বা বার্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট তাদের দীনকে নবায়ন করার জন্য নবী প্রেরণ করেন।

(৩) বা পূর্ববর্তী নবীর শরী‘আত তার যুগেই কার্যকর ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে ছিল অকার্যকর, তখন আল্লাহ তা‘আলা এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি সেই যুগ এবং স্থানের উপযুক্ত রিসালাত ও শরী‘আত বহন করেন। তিনি তাকে পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন, যাতে করে তাঁর রিসালাত থাকে জীবন্ত, যার দ্বারা মানুষ হয় উজ্জীবিত এবং সকল পরিবর্তন ও বিকৃতি হতে থাকে নির্মল। আর এ কারণেই তাঁকে আল্লাহ তা‘আলা সকল রিসালাতের পরিসমাপ্তি করেন।[৬৬]

আর আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যেসব জিনিস নির্দিষ্ট করেছেন, তা হচ্ছে: তিনি সর্বশেষ নবী। সুতরাং তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাধ্যমেই রিসালাতকে পূর্ণ এবং শরী‘আতকে সমাপ্ত করেন। আর তাঁর নবুওয়াতের মাধ্যমেই তাঁর সম্পর্কে ‘ঈসা মাসীহ ‘আলাইহিস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়, যেহেতু তিনি বলেন: “তোমরা কি কিতাবে (ইঞ্জিলে) কখনও পড়নি: নির্মাতারা যে পাথরকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই অবশেষে এক প্রান্তের নেতা হয়ে যায়।”[৬৭]

আর খ্রিষ্টান পুরোহিত ইবরাহীম, যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন, এই উদ্ধৃতিকে স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের সম্পর্কে যা বলেন তার সাথে মিল গণ্য করেন। তিনি বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ এমন, যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল কিন্তু গৃহের এক প্রান্তে একটি ইটের স্থান খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকেরা গৃহটিকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল, আর বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমিই সেই ইট এবং আমি শেষ নবী।[৬৮]

আর এ কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তাকে আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবসমূহের তত্ত্বাবধায়ক এবং তাদের রহিতকারী করেছেন। যেমন, তাঁর শরী‘আতকে পূর্ববর্তী সকল শরী‘আতের রহিতকারী করেছেন। আর তিনি তাঁর রিসালাতকে হিফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে তা মুতাওয়াতির বা অসংখ্য নিশ্ছিদ্র ধারাবাহিকতা সহকারে বর্ণিত হয়েছে, যেমন কুরআনুল কারীম পঠিত ও লিখিত উভয়ভাবে বর্ণিত হয়। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কর্ম জাতীয় সুন্নত এবং এই

দীনের বিধানাবলী তথা বাস্তবিক ব্যবহার, ইবাদাত, সুন্নাত ও হুকুম-আহকামসমূহও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি কেউ সীরাত ও সুন্নাতের কিতাবাদি অনুসন্ধান করে, তবে সে জানতে পারবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মানবজাতির জন্য তাঁর যাবতীয় অবস্থাদি এবং সকল বাণী ও কর্মসমূহ হিফাযত করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদাত, জিহাদ, যিকির ও ইস্তেগফার এবং তাঁর বদান্যতা ও সাহস, আপন সাথীদের সাথে ও তাঁর কাছে যেসব প্রতিনিধি ও আগন্তুক

আসত তাদের সাথে তাঁর ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু তারা বর্ণনা করেন। যেমন- তারা তাঁর আনন্দ, বেদনা, প্রস্থান, অবস্থান, পানাহার ও পোশাকের বিবরণ, জাগরণ ও নিদ্রা ইত্যাদি বর্ণনা করেন। সুতরাং আপনি যদি এগুলো উপলব্ধি করেন, তবে নিশ্চিত হবেন যে, এই দীন আল্লাহর তত্ত্বাবধানে তাঁর জন্য সংরক্ষিত। আর তখন জানবেন যে, তিনি নবী ও রাসূলদের শেষ। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এই রাসূলই হচ্ছেন নবীদের শেষ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠﴾ [الاحزاب : ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০]

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেন, “আমি সমস্ত মানবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সমাপ্ত হয়েছে।[৬৯]

ইসলাম পরিচিতি

এক্ষণে আমরা এসে পৌঁছেছি ইসলামের সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় এবং তার হাকীকত, উৎস, রোকন ও স্তরসমূহের বর্ণনায়।

ইসলাম শব্দের অর্থ:

আপনি যদি ভাষার অভিধানসমূহ পর্যালোচনা করেন, তাহলে জানতে পারবেন, ইসলাম শব্দের অর্থ হলো: আনুগত্য, বিনয়, বশ্যতা, আত্মসমর্পণ এবং আদেশ দাতার আদেশ ও নিষেধকারীর নিষেধকে বিনা আপত্তিতে পালন করা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সত্য দীনের নাম রেখেছেন ‘ইসলাম’। কারণ তা বিনা আপত্তিতে আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর আদেশের কাছে

আত্মসমর্পণ, যাবতীয় ইবাদাতকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্ধারণ এবং তাঁর সংবাদকে সত্যায়ন ও তার ওপর ঈমান আনয়ন করাকে বুঝায়। এভাবে ‘ইসলাম’ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন এসেছেন তার নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

ইসলামের পরিচয়:

দীনের নামকরণ ইসলাম কেন করা হয়েছে? সমগ্র পৃথিবীতে যেসব দীন রয়েছে তার নামকরণ, হয় এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের দিকে সম্বন্ধ করে অথবা নির্দিষ্ট কোনো জাতির দিকে সম্বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সুতরাং নাসারা ধর্মের (খ্রীষ্টধর্ম) নামকরণ

হয়েছে “আন্‌ নাসারা” শব্দ হতে। বৌদ্ধধর্মের নামকরণ করা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের নামের ওপর ভিত্তি করে। আর যরথস্তুবাদ এই নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে, কারণ তার প্রতিষ্ঠাতা ও ঝাণ্ডা বহনকারী হলো যরথস্তু। এমনিভাবে ইয়াহূদী ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে “ইয়াহুদা”নামক এক পরিচিত গোত্রের মাঝে, ফলে তা ইয়াহূদী ধর্ম নামকরণ হয়। এমনিভাবে অন্যান্য ধর্মগুলোর নামকরণও এভাবে হয়, কিন্তু ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তাকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে অথবা নির্দিষ্ট কোনো জাতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়নি। বরং এর নাম

এমন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে যা ইসলাম শব্দের অর্থকে শামিল করে। আর এই নাম থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, এই দীন আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো মানুষের প্রচেষ্টা কাজ করেনি এবং তা সকল জাতি বাদ দিয়ে কোনো নির্ধারিত জাতির জন্য নির্দিষ্টও নয়। বরং এ নাম দাবী করে যে, “ইসলাম” নামের বৈশিষ্ট্যে যেন সবাই সুসজ্জিত হয়। সুতরাং অতীত ও বর্তমান মানুষের প্রত্যেকে যারাই এই গুণে গুণান্বিত হবে, সেই মুসলিম। আর ভবিষ্যতেও যারা এই গুণে সুসজ্জিত হবে সেও মুসলিম হবে।

ইসলামের হাকীকত বা তাৎপর্য:

এ কথা সবার জানা যে, এই পৃথিবীর সবকিছু নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মেনে নিজ নিজ গতিতে চলছে। যেমন- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও ভূমণ্ডল প্রচলিত সাধারণ নিয়মের অধীনে চলছে। এই নিয়ম-নীতি থেকে এক চুল পরিমাণ নড়াচড়া করা এবং তা থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। এমনকি স্বয়ং মানুষ যদি তার নিজের বিষয় নিয়ে ভাবে, তাহলে তার কাছে স্পষ্ট হবে যে, সে আল্লাহর নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুগত। তাই সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী নিঃশ্বাস গ্রহণ করে এবং পানি, খাদ্য,

আলো ও বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী চলছে। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই অঙ্গগুলো কাজ করে থাকে।

আল্লাহর এই ব্যাপক নির্ধারণ বা নিরূপণ, যার কাছে আত্মসমর্পণ করে চলছে এ জগতের সবকিছু বরং এ বিশ্বজগতের কোনো কিছুই তার আনুগত্য হতে বের হতে পারছে না। আকাশের সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হতে যমীনের ক্ষুদ্র বালু কণা পর্যন্ত ক্ষমতাবান মহান আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে। সুতরাং আকাশ,

যমীন ও এতদুভয়ের মাঝের সবকিছু যখন এই নিয়ম মেনে চলছে, তখন বলতে পারি পুরো পৃথিবীই এই মহান শক্তিধর মালিকের আনুগত্য করছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয় ইসলামই বিশ্বজগতের উপযুক্ত ধর্ম। কারণ ইসলাম অর্থ হলো, কোনো আপত্তি ছাড়াই নির্দেশদাতার নির্দেশ মান্য ও আনুগত্য করা এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, যেমন কিছু আগেই আপনি জানতে পেরেছেন। সুতরাং সূর্য, চন্দ্র, যমীন, বাতাস, পানি, আলো, অন্ধকার, উত্তাপ, গাছপালা, পাথর, জীব-জন্তু সবই অনুগত। বরং এমন মানুষ যে তার রবকে চেনে না, তার অস্তিত্বকে

অস্বীকার করে, তাঁর নিদর্শনাবলিকে অমান্য করে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করে এবং তাঁর সঙ্গে অন্যকে অংশীদার করে, সে ব্যক্তিও ফিতরাতের দিক থেকে তাঁর অনুগত, যার ওপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

পৃথিবীর সবকিছু যখন অনুগত হয়ে চলছে, তখন আসুন আমরা মানুষের ব্যাপারটি নিয়ে ভেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাব দু’টি বিষয় মানুষের সাথে নিরন্তর ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে:

প্রথমত: ফিত্বরাত বা মানব মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি।

মহান আল্লাহ যে ফিতরাত দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা হলো, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাঁর ইবাদাত ও নৈকট্য অর্জনকে ভালোবাসা। আল্লাহ যে হক, কল্যাণ ও সত্যকে ভালোবাসেন তা ভালোবাসা এবং তিনি যে অসত্য, অমূলক, অন্যায় অত্যাচার অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা। এগুলোর সাথে যুক্ত হবে ফিতরাতের আরও অনেক চাহিদা, যেমন- সম্পদ, পরিবার, সন্তান সন্ততির মোহ, খাদ্য-পানীয় ও বিবাহের প্রতি দুর্বলতা এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-পতঙ্গের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে চাহিদার প্রয়োজন অনুভব করে তাও।

দ্বিতীয়ত: মানুষের ইচ্ছা ও পছন্দের স্বাধীনতা। আল্লাহ তা‘আলা তার নিকট বহু সংখ্যক নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন, আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে সে সত্য ও অসত্য, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তারপর বিবেক ও বুঝ শক্তি দিয়ে তাকে শক্তিশালী করেছেন, যাতে করে কোনো কিছু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। সুতরাং যদি সে কল্যাণের পথে চলতে ইচ্ছা করে, তবে তা তাকে ন্যায় ও হিদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। আর যদি অকল্যাণের পথের পথিক হতে চায়, তবে তা তাকে অনিষ্ট ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যাবে।

অতএব, আপনি যদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তাহলে আপনি তাকে আত্মসমর্পণের ওপর উন্মুক্ত এবং তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জন্মগত স্বভাব বিশিষ্ট হিসেবে পাবেন। আসলে এক্ষেত্রে তার অবস্থা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের মতোই।

আর যদি দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তাহলে আপনি তাকে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হিসেবে পাবেন। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো কিছু নির্বাচন করতে পারে। চাইলে মুসলিম অথবা কাফির হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا ٣﴾ [الانسان: ٣]

“সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।” [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৩]

মূলত এ কারণেই আপনি এই পৃথিবীতে দু’রকম মানুষ পাবেন:

এক প্রকার মানুষ তার সৃষ্টিকির্তার পরিচয় জানে, তাঁকে রব, শাসনকর্তা মা‘বুদ মেনে তাঁর প্রতি ঈমান আনে। ঐচ্ছিক জীবনে সে তাঁর বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে চলে, যেমনিভাবে তার রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা থেকে পিছিনে ফেরার বিকল্প কোনো পথ নেই এবং তাকদীরকে মেনে চলে থাকে। এই

ব্যক্তিই হলো প্রকৃত মুসলিম, যে তার ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছে এবং তার জানা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে জানতে পেরেছে, যিনি তার নিকট অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাকে বিদ্যা অর্জনের শক্তি দান করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তির বিবেক ও বিবেচনা শক্তি বিশুদ্ধ হয়েছে। কেননা সে তার চিন্তা-চেতনার সঠিক মূল্যায়ন করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না; যিনি সকল বিষয়ে বুঝ ও বিবেচনা শক্তি দান করে তাকে সম্মানিত করেছেন। আর তার জিহ্বা শুধু সঠিক ও সত্য কথা বলতে শেখায়; কেননা সে

আল্লাহকেই রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, যিনি তাকে কথা বলার শক্তি দিয়ে ধন্য করেছেন। আসলে এমতাবস্থায় তার পুরো জীবন শুধু সত্যের ওপর বিচরণ করে; কারণ সে আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে অনুগত, যার মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত আছে। আর তার মাঝে এবং পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টিকুলের মাঝে পারস্পরিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার বন্ধন সম্প্রসারিত হয়; কেননা সে মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাবান আল্লাহর দাসত্ব করে, যার দাসত্ব, নির্দেশ এবং তাকদীর বা নির্ধারণের অনুগত হয়ে চলছে সমস্ত সৃষ্ট জীব। আর হে মানুষ! আর এগুলোকে তো আপনার কল্যাণের

জন্যই অনুগত করে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

কুফরের প্রকৃত অবস্থা:

অপর দিকে আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা পরাজিত আত্মসমর্পণকারী রূপে জন্ম গ্রহণ করে আজীবন পরাজিতরূপে আত্মসমর্পণ করতঃ জীবন অতিবাহিত করে; কিন্তু সে নিজের আত্মসমর্পণবোধকে অনুধাবন করতে পারে না, বুঝতেও সক্ষম হয় না। সে তার রবকে চিনে না, তাঁর শরী'আতের ওপর ঈমান আনে না, তাঁর রাসূলগণের অনুসরণ করে না, মহান আল্লাহ যে তাকে জ্ঞান ও বিবেক শক্তি দান করেছেন এবং তাকে শ্রবণ ও দর্শন

শক্তি দান করেছেন তার সৃষ্টিকর্তাকে চেনার জন্য, সেটাও সে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে না। বরং সে তার রবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাঁর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং তার সার্বিক জীবনের যে বিষয়ে তাকে গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সে আল্লাহর শরী'আত পালনকে অস্বীকার করে অথবা তার প্রভুর সাথে অন্যকে অংশীদার করে এবং তাঁর একত্ববাদের নিদর্শনকে মানতে অস্বীকার করে। এ ব্যক্তিই হলো প্রকৃত কাফের। কারণ কুফরের অর্থ হলো: গোপন করা, ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা। আসলে এই ধরনের

লোককে কাফের বলা হয়; কারণ সে তার ফিতরাত তথা স্বাভাবিক প্রকৃতিকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। একটু আগে জানতে পেরেছেন যে, সে ইসলামের ফিতরাতের ওপর জন্ম গ্রহণ করেছে। আর তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ফিতরাত অনুসারেই কাজ করে থাকে। তার আশে পাশে সবকিছু আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে চলছে। কিন্তু সে তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার গোপন পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এতে করে তার দৃষ্টিশক্তি থেকে তার ও দুনিয়ার ফিতরাতের কার্যকারিতা অদৃশ্য হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আপনি তাকে দেখবেন, সে তার চিন্তা ও জ্ঞান

শক্তি তার ফিতরাতের বিপক্ষে ব্যবহার করছে। এর বিপরীত দিকগুলোই শুধু সে দেখতে পায় এবং এ ফিত্বরাতকে উচ্ছেদ করতেই সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

এখন আপনি আপনার বিবেকে শক্তি দিয়ে চিন্তা করে দেখুন, একজন কাফের কতটা ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারে ডুবে আছে।[৭০]

ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে আপনি মেনে চলবেন এটাই ইসলামের দাবী। এটা খুব কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ যার জন্য সহজ করেছেন তার জন্য অতি সহজ। সমস্ত জগত ইসলামের দিক-

নির্দেশনা মেনে চলছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَغَيۡرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبۡغُونَ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ٨٣﴾ [ال عمران: ٨٣]

“আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৩]

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন ও জীবন ব্যবস্থা; সে কথা ঘোষণা করে বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ١٩﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯] আর তা হচ্ছে, চেহারা ও সত্তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে সমর্পণ করা। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِنۡ حَآجُّوكَ فَقُلۡ أَسۡلَمۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِۗ ٢٠﴾ [آل عمران: ٢٠]

“আর যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলুন: আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের পরিচয় বর্ণনা করে বলেন,

«أن تسلم قلبك لله ، وأن تولي وجهك لله ، وتؤتي الزكاة المفروضة»

“ইসলাম হলো তুমি তোমার অন্তরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমর্পণ করবে, তোমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর জন্যই ফিরাবে এবং যাকাত ফরয হলে তা আদায় করবে।”[৭১]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইসলাম কি? উত্তরে তিনি বলেন,

«أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ» ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

«الْإِيمَانُ» ، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»

“আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার অন্তরকে সোপর্দ করা এবং আপনার জিহ্বা হাতের অনিষ্টতা হতে সকল মুসলিমের নিরাপত্তা লাভ করা। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করল: ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন, ঈমান আনয়ন করা। লোকটি বলল: ঈমান কী? তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া।” [৭২]

এমনিভাবে তিনি এর পরিচয়ে অন্যত্র বলেন,

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»

“ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসের সাওম পালন করা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘর (কা‘বার) হজ পালন করা।”[৭৩]

তিনি আরও বলেন,

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

“প্রকৃত মুসলিম তো সেই যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।”[৭৪]

আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারো নিকট থেকে গ্রহণ করবেন না। কারণ সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ছিলেন দীন ইসলামের ওপর। আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةٗ ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١

فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٧٢﴾ [يونس : ٧١، ٧٢]

“আর তাদেরকে নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনান। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ প্রদান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ ওপর নির্ভর করি। সুতরাং তোমরা তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও এবং তোমারা যাদেরকে শরীক করেছ তাদেরকেও ডাক, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন অস্পষ্টতা না থাকে।

তারপর আমার সম্বন্ধে তোমাদের

কাজ শেষে করে ফেলে এবং আমাকে অবকাশ দিও না। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের কাছে আমি তো কোনো পারিশ্রমিক চাইনি, আমার পারিশ্রমিক আছে তো কেবল আল্লাহ কাছে, আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্টপ্রাপ্ত হয়েছি।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭১-৭২]

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তিনি বলেন,

﴿إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١﴾ [البقرة: ١٣١]

“যখন তার প্রভু তাকে বললেন, তুমি আনুগত্য স্বীকার কর (মুসলিম হও)

তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩১]

মূসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ٨٤﴾ [يونس : ٨٤]

““আর মূসা বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো, তবে তাঁরই ওপর ভরসা কর,যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪]

আর তিনি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي
وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ ١١١﴾
[المائدة: ١١١]

“আর যখন আমি হাওয়ারিদেরকে আদেশ করলাম, আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১১১][৭৫]

ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান, আকীদাহ-বিশ্বাস সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত অহী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ হতে গ্রহণ করা হয়। আমি এখন এ

দু'টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও তার উৎসসমূহ

মানব রচিত ও রহিত হওয়া ধর্মগুলোর অনুসারীরা তাদের মাঝে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিতাবসমূহকে পবিত্র করার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছে। সে সব কিতাব লেখা হয়েছিল প্রাচীন যুগে। ফলে এ সমস্ত কিতাব কে লিখেছে বা কে তার অনুবাদ করেছে বা কোন সময় লেখা হয়েছে, তার কোন সত্যতা জানা যায় না। বরং এগুলো এমন সব মানুষেরা লিখেছিল যাদের মাঝে ঐসব গুণ থাকে যা অন্য মানুষের মাঝেও থাকে। যথা-

দুর্বলতা, ঘাটতি, প্রবৃত্তি, ভুল ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে অন্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; কারণ তা হক বা সত্য মূলনীতির (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অহীর) ওপর নির্ভর করে তথা “কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস)”। নিচে এ দু’টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

(ক) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন:

ইতোপূর্বে আপনি জেনেছেন যে, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দীন। আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেন, যা মুত্তাক্বীন তথা পরহেজগার বান্দাদের জন্য হিদায়াত এবং মুসলিমদের জন্য সংবিধানস্বরূপ। আর আল্লাহ যাদের (কুফুরী ও নিফাকী) থেকে আরোগ্য কামনা করেন তাদের অন্তরের রোগমুক্তি এবং যাদের মুক্তি ও (হিদায়াতের) আলো কামনা করেন তাদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ সমস্ত মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, যে কারণে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।[৭৬]

এটি আসমানী কিতাব হওয়ার ব্যাপারে নতুন নয়, যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাসূল হওয়ার ব্যাপারেও নতুন ছিলেন না। বরং এর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ওপর সহীফা অবতীর্ণ করেন, মূসা ‘আলাইহিস সালামকে তাওরাত ও দাউদ ‘আলাইহিস সালামকে যাবূর দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেন। এমনিভাবে ‘ঈসা মাসীহ ‘আলাইহিস সালাম ইঞ্জীল নিয়ে আসেন। এ সব কিতাব ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী, যা তিনি তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণকে অহী করেছিলেন। এসব পূর্ববর্তী কিতাবের সংখ্যা অনেক। কিন্তু এর অধিকাংশই বিলীন

হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন এবং তিনি তাকে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের তত্ত্বাবধায়ক ও রহিতকারী করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ٤٨﴾ [المائدة: ٤٨]

“আর আমরা এ কিতাব (কুরআন)কে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি হককের সাথে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষকও।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে, এতে প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ফলে মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ [النحل:٨٩]

“আর আমরা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যা প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯]

আর তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَقَدۡ جَآءَكُم بَيِّنَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞۚ ١٥٧﴾ [الانعام: ١٥٧]

“আর তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং হিদায়াত ও রহমত সমাগত হয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৭]

এটি যে পথনির্দেশ করে তা হচ্ছে সব চাইতে সঠিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ﴾ [الاسراء: ٩]

“নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম (সরল, সুদৃঢ়)।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯] অতএব, তা মানবজাতিকে এমন পথ

প্রদর্শন করে যা তাদের জীবনের সকল বিষয়ে সঠিক।

[আর যে চিন্তা-ভাবনা করে যে, কীভাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে? তাহলে সে কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে এবং সে তার ইচ্ছাকেও আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤﴾ [الشعراء : ١٩٢، ١٩٤]

“নিশ্চয় এটি (আল-কুরআন) বিশ্বজাহানের রব হতে অবতারিত। রূহুল

আমীন (জিবরীল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১৯২-১৯৪]

সুতরাং, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেন, তিনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ। আর যার মাধ্যমে তা অবতরণ হয়, তিনি রূহুল আমীন তথা জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম। আর যার অন্তরে তা অবতরণ করা হয় তিনি হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।][৭৭]

এই কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত নিদর্শন কিয়ামত অবধি অবশিষ্ট

থাকবে তার অন্তর্গত একটি স্থায়ী নিদর্শন। অথচ পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের নিদর্শন ও মু‘জিযাসমূহও শেষ হয়ে যেত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা‘আলা এই কুরআনকে একটি স্থায়ী নিদর্শন বা প্রমাণস্বরূপ করেছেন।

এটা একটি পরিপূর্ণ প্রমাণপত্র ও সমুজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন তারা যেন কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব অথবা কুরআনের সূরার অনুরূপ দশটি সূরা অথবা একটি সূরা নিয়ে আসে। কিন্তু তারা কয়েকটি অক্ষর বা শব্দ বানাতেও অপারগ হয়। অথচ যে জাতির ওপর

কুরআন অবতীর্ণ হয়, তারা ছিল ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জাতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣٨﴾ [يونس : ٣٨]

“নাকি তারা বলে, ‘তিনি এটা রচনা করেছেন?’ বলুন, ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৮]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী তার প্রমাণ হলো:

এর মধ্যে পূর্ববর্তী জাতির বহু সংবাদ

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সম্মুখে আগমনকারী যেসব ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যিদ্বাণী করেছে তা হুবহু ঐভাবেই ঘটছে যেভাবে কুরআন সংবাদ দিয়েছে। আর অনেক বিষয়ে এমন সব বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উল্লেখ করেছে, বিজ্ঞানীরা যার কিছু কিছু মাত্র বিষয়ে বর্তমান যুগে এসে উপনীত হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী, তার আরও প্রমাণ হলো: যে নবীর ওপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়, তাঁর কাছ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুরূপ কিছু জানা যায়নি এবং তার সদৃশ কোনো

বিষয়েও বর্ণনা করা হয়নি যা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لَّوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوۡتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَدۡرَىٰكُم بِهِۦۖ فَقَدۡ لَبِثۡتُ فِيكُمۡ عُمُرٗا مِّن قَبۡلِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٦﴾ [يونس : ١٦]

“বলুন, আল্লাহ যদি চাইতেন আমিও তোমাদের কাছে এটা তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি; তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৬] বরং তিনি ছিলেন এমন নিরক্ষর ব্যক্তি যে, তিনি পড়তে ও লিখতে জানতেন না। এমনকি তিনি

কোনো শিক্ষকের নিকট গমন করেননি এবং কোনো শিক্ষকের কাছে বসেননি। এতদসত্ত্বেও তিনি বিশুদ্ধভাষী ও অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ কাফিরদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ٤٨﴾ [العنكبوت: ٤٨]

“আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো দিন কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে।” [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৪৮]

এই নিরক্ষর নবীর বৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এমন নিরক্ষর, যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না। অথচ ইয়াহূদী ও নাসারাদের যেসব পাদ্রী বা পণ্ডিতদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু অবশিষ্ট আছে, তারা যে ব্যাপারে মতভেদ করে সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং তারা পরস্পর যে বিষয়ে ঝগড়া করে সে বিষয়ে তারা তাঁর নিকট বিচার প্রার্থনা করেছিল। তাওরাত ও ইঞ্জিলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সংবাদ পরিষ্কারভাবে বলেছেন-

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم

بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবিদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্যে করে ইয়াহূদী ও নাসারারা যে প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তা'আলা তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে বলেন,

﴿يَسۡـَٔلُكَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيۡهِمۡ كِتَٰبٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ﴾ [النساء : ١٥٣]

“কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৩] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ﴾ [الاسراء: ٨٥]

“আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৫]

মহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَن ذِي ٱلۡقَرۡنَيۡنِۖ﴾ [الكهف: ٨٣]

“আর তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৮৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَكۡثَرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ٧٦ ﴾ [النمل: ٧٦]

“বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, নিশ্চয় এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের কাছে বিবৃত করে।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৭৬]

ইবরাহীম ফিলিপিস নামক এক খৃষ্টান পাদ্রী ডিগ্রি অর্জনের জন্য তার ডক্টরেট থিসিসের মধ্যে কুরআনকে সন্দেহযুক্ত করার অপচেষ্টা চালান।

কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। বরং কুরআন তার দলীল প্রমাণাদি দ্বারা তাঁকে পরাভূত করে। ফলে তিনি তার অক্ষমতার ঘোষণা দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তিনি তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[৭৮]

এমনভাবে একজন মুসলিম আমেরিকান নাগরিক ড. জাফরী লাং নামক এক ভদ্রলোককে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনুবাদের একখানা কপি দিলে সে তা পাঠ করে অনুভব করে যে, এই কুরআন যেন তাকেই সম্বোধন করে কথা বলছে। আর তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তার ও তার

অন্তরের মাঝে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা অপসারণ করেছে। বরং সে বলে, নিশ্চয় যে সত্তা এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি যেন আমাকে আমি যতখানি জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।[৭৯] কেনই বা নয়? যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনিই তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মহা পবিত্র আল্লাহ।

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৪] সুতরাং কুরআনুল কারীমের অনুবাদ পড়াটাই ড.

জাফরীর ইসলামের মধ্যে প্রবেশ এবং উক্ত গ্রন্থ লেখার কারণ, যে গ্রন্থ থেকে আপনাকে রেফারেন্স দিলাম।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে তা নিয়ম-পদ্ধতি, আকীদাহ-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম, পারস্পরিক সম্পর্ক বা লেনদেন এবং আদব-কায়দাসমূহের মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ٣٨﴾ [الانعام: ٣٨]

“আমরা (এই) কিতাবে কোনো বস্তুর কোনো বিষয়ই লিপিবিদ্ধ করতে ছাড়িনি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩৮]

সুতরাং এর মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের আহ্বান, তাঁর নাম, সিফাত বা বৈশিষ্ট্য-গুণাবলি ও কর্মসমূহের বর্ণনা রয়েছে। তা নবী ও রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার দিকে আহ্বান করে। কিয়ামত দিবস, কর্মের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশকে সাব্যস্ত এবং এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ ও দুনিয়াতে তাদের প্রতি যে নিদর্শনসমূহ

অবতীর্ণ হয়ছেলি এবং যসেব শাস্তি ও দুর্ভোগ তাদরে জন্য আখরোতে অপক্ষো করছে তা বর্ণনা কর।ে

এর মধ্যে অনকে জনিসিরে এমন নদির্শন, যুক্তি ও দলীল-প্রমাণাদি রয়ছে,ে যে ব্যাপার বেজ্ঞিানীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়,ে আর তা প্রত্যকে যুগরে অনুকূলে হয়। বজ্ঞিানী ও গবষেকেরা এর মধ্যে তাদরে কাঙ্ক্ষতি বস্তু পায়। এখন আমি আপনার জন্য শুধুমাত্র তনিটি উদাহরণ পশে করব যা আপনাকে এর কছিুটা প্রকাশ করে দবি।ে উদাহরণগুলো নম্নিরূপ:

(১) আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞ وَجَعَلَ بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٗا وَحِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا ٥٣﴾ [الفرقان: ٥٣]

“আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, মজাদার এবং অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ; উভয়ের মধ্যে করেছেন এক অন্তরায়, এক শক্ত ব্যবধান।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৩]

মহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন,

﴿أَوۡ كَظُلُمَٰتٖ فِي بَحۡرٖ لُّجِّيّٖ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠﴾ [النور : ٤٠]

“অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপর ঢেউ, যার উপর মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোনো আলো নেই।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪০]

আর সর্বজন বিদিত যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সমুদ্রে গমন করেননি এবং সমুদ্রের গভীরতা অনুসন্ধানে সাহায্য করবে এ ধরনের কোনো বস্তুগত মাধ্যমও তাঁর যুগে ছিল না। সুতরাং

আল্লাহ ব্যতীত আর কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ তথ্যাবলি জানিয়েছেন?

(২) আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ١٢ ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ ١٣ ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤﴾ [المؤمنون : ١٢، ١٤]

“আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ ভাণ্ডারে; পরে আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি ‘আলাকা-তে, অতঃপর ‘আলাকা-কে পরিণত করি

গোশতপিণ্ডে, অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব, (দেখে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-মু‘মিনূন, আয়াত: ১২-১৪]

বিজ্ঞানীরা বর্তমান যুগে এসেই কেবল গর্ভস্থ সন্তানের (ভ্রূণের) সৃষ্টির ধাপ সম্পর্কে এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উদঘাটন করে।

(৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ [الانعام:٥٩]

“গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ থেকে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনিভাবে যেকোনো সিক্ত ও শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৯] মানবজাতি এই ব্যাপক চিন্তা

পর্যন্ত বিবেচনা করতে পারে না এবং এ ব্যাপারে চিন্তাও করে না অধিকন্তু তারা তা করতে সক্ষমও না। বরং বিজ্ঞানীদের কোনো দল যদি একটি অঙ্কুর অথবা একটি কীট-পতঙ্গ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার সম্পর্কে যা জানতে পেরেছে তা রেকর্ড করে, তাহলে সে কারণে আমরা খুবই বিস্ময় প্রকাশ করি। অথচ তারা যে ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করছে তার চেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাছে গোপন রয়েছে।

ফ্রান্সের অধিবাসী বিজ্ঞানী ‘মরিস বুকাই’ তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের মাঝে তুলনা করে এবং ভূমণ্ডল ও

নভোমণ্ডল এবং মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে সাম্প্রতিক আবিষ্কার যেখানে পৌঁছেছে তা বর্ণনা করে। তাতে তিনি পেয়েছেন, সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তার হুবহু মিল রয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, মানুষ এবং জীবজন্তুর সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত দেখেছেন।[৮০]

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ তথা হাদীস:

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি

কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেন এবং তার সদৃশ আরও কিছু অহী করেন তাই হলো সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ, হাদীস। যা কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও ভিত্তি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জেনে রেখো! আমাকে কুরআন ও তার সাথে তার সদৃশ কিছু দেয়া হয়েছে।[৮১]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন কুরআনের মধ্যে যা রয়েছে তা বর্ণনা করেন যেমন— তাতে আছে ‘ইজমাল’ বা সংক্ষিপ্ত, তাতে আছে ‘খুসূস’ বা বিশেষ, তাতে আছে ‘উমূম’ বা

ব্যাপক ইত্যাদি, আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ٤٤]

“আর আমরা আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 44]

সুন্নাহ বা হাদীস হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস। আর তা প্রত্যেকে যা সহীহ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, যার সূত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিক, হোক তা কথা অথবা কাজ অথবা সম্মতি অথবা গুণ বা বৈশিষ্ট্য হোক না কেন।

আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ٥﴾ [النجم : ٣، ٥]

“আর তিনি প্রবৃত্তি হতে কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তো এক অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। তাকে শিক্ষা দান করে মহা শক্তিশালী (ফিরিশতা)।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩, ৫]

তাঁকে যা আদেশ করা হয়েছে তিনি মানুষের নিকট তাই প্রচার করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ مُّبِينٞ ٩﴾ [الاحقاف: ٩]

“আমার প্রতি যা অহী করা হয় আমি তো শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।” [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত:৯]

পবিত্র সুন্নাহ হলো ইসলামের বাস্তবিক ব্যবহার। যেমন এতে রয়েছে, বিধি-বিধান, আকীদাহ-বিশ্বাস, ইবাদাত, পারস্পরিক সম্পর্ক বা লেনদেন, আদব-কায়দা ইত্যাদি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা হুকুম দেয়া হয়েছে তা তিনি পালন করেছেন এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যেভাবে করেন, ঠিক অনুরূপভাবে তাদেরকেও করার নির্দেশ

দনে। যমেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী তনিি বলনে,

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“তোমরা ঠকি ঐভাবে সালাত পড়, যভোবে আমাকে সালাত পড়তে দখেছো।”[৮২]

আল্লাহ তা‘আলা মুমনিদরেকে তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজরে অনুসরণ করতে নরি্দশে দয়িছেনে, যাতে করে তাদরে ঈমান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলনে,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [الاحزاب : ٢١]

“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ’র মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মসমূহকে তাদের পরবর্তীদের (অর্থাৎ তাবে‘ঈদের) নিকট বর্ণনা করেন এবং তারা তাদের পরবর্তীদের (অর্থাৎ তাবে‘ তাবে‘ঈদের) নিকট বর্ণনা করেন, অতঃপর সেগুলোর সংকলন হাদীসের ভাণ্ডারে পরিণত হয়। আর হাদীস বর্ণনাকারী তার নিকট

থেকে যারা বর্ণনা করবেন তাদের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যারা তার নিকট থেকে গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে তারা তলব করেন যে সে তিনি ব্যক্তির সমসাময়িক হবেন যে তার নিকট হতে গ্রহণ করেছে। যাতে করে সূত্রের ধারাবাহিকতা বর্ণনাকারী থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত হয়।[৮৩] আর বর্ণনা সূত্রের সকল বর্ণনাকারী যেন নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হয়।

সুন্নাহ যেমন ইসলামের বাস্তবিক ব্যবহার, তেমনি তা কুরআনুল কারীমকে

প্রকাশ করে এবং এর আয়াতের ব্যাখ্যা করে ও সংক্ষিপ্ত হুকুম-আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তিনি কখনও কথার মাধ্যমে, কখনও কর্মের মাধ্যমে, আবার কখনও এতদুভয়ের মাধ্যমে একসাথে ব্যাখ্যা করতেন। আবার হাদীস কতিপয় বিধান ও আইন প্রণয়ন বর্ণনা করার দিক দিয়ে কুরআনুল কারীম হতে স্বাধীন।

কুরআন ও হাদীসের প্রতি এই বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে, এই দু’টি দীন ইসলামের মূল দু’টি উৎস। যে দু’টির অনুসরণ করা, যার দিকে প্রত্যাবর্তন

করা, যার আদেশ মান্য করা ও নিষেধকে বর্জন করা, যার সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করা, এ দু’টির মধ্যে যেসব আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলি ও তাঁর কর্মসমূহ রয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখা এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ওলী-আওলিয়া মুমিনদের জন্য যা প্রস্তুত করেছেন ও তাঁর শত্রু কাফিরদের জন্য যার প্রতিশ্রুতি করেছেন তার প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء : ٦٥]

“অতএব, আপনার রবের শপথ! তারা কখনও মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নিবে, অতঃপর আপনি যে বিচার করবেন তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে আর তা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে

বরিত থাক।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত:৭]

এই দীন বা ধর্মরে উৎসরে পরচিয় প্রদানরে পর আমাদরে উচতি হবে এর স্তরসমূহ বর্ণনা করা। আর তা হচ্ছে- ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। সংক্ষপি্তভাবে এই স্তরগুলোর আরকান বা স্তম্ভসমূহ আলোচনা করব ।

দীনরে স্তরসমূহ

দীনরে প্রথম স্তর: ইসলাম*[৮৪]

ইসলাম: এর পাঁচটি রুকন যথা: দু’টি সাক্ষ্য দয়ো (কালমোয়ে শাহাদাত),

সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা ও হজ করা।

প্রথমত: (কালেমায়ে শাহাদাত) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

"আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই" সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো: আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনিই সত্য উপাস্য, তিনি ব্যতীত আর সব বাতিল বা অসত্য।[৮৫] এর দাবী হচ্ছে যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীর একনিষ্ঠতাকে একমাত্র

আল্লাহর জন্য স্থরি করা। আর তনিি ব্যতীত অন্য সকলরে জন্য তা নাকচ করা। এ কালমোর সাক্ষ্যদাতা যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে দু’টি বষিয় সাব্যস্ত না করবে ততক্ষণ সে লাভবান হতে পারবে না।

এক- [এর অর্থ ও দাবী] জানা ও বুঝা, [এটার ওপর] বশি্বাস স্থাপন, দৃঢ়তা অর্জন, সত্যায়ন, [নষ্ঠিা, মনে-প্রাণে গ্রহণ করা] এবং ভালোবাসার সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা।

দুই- আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যাদরে উপাসনা করা হয় তাদরেকে অস্বীকার করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দয়ে কন্তিু আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য

যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করে না, তবে এই সাক্ষ্য তার কোনোই উপকারে আসবে না।[৮৬]

আর “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল” বা দূত এই সাক্ষ্যদানের অর্থ হলো,

*তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা,

*যে বিষয়ে খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা,

*যা থেকে নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা পরিহার করা এবং

*তাঁর তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

আর একথা জেনে রাখা ও বিশ্বাস পোষণ করা যে,

*মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জন্য আল্লাহর রাসূল।

আরও বিশ্বাস করা যে,

*তিনি দাস, তাঁর ইবাদাত করা যাবে না।

*তিনি রাসূল, তার ওপর মিথ্যারোপ করা যাবে না। বরং তাঁর আনুগত্য করা হবে ও অনুসরণ করা হবে।

*যে কেউ তার আনগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে,

*আর যে কেউ তার অবাধ্য হবে জাহান্নামে যাবে।

আরও বিশ্বাস স্থাপন করা যে,

*আকীদাহ বিষয়ে হোক, আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ইবাদাত সম্পর্কিত হোক, বিচার ও আইন বিষয়ক হোক, আখলাক সম্পর্কিত হোক অথবা সমাজ ও পরিবার গঠন বিষয়ে হোক অথবা হালাল ও হারাম সম্পর্কিত হোক না কেন, আপনি কোনো বিষয়েই একমাত্র এই সম্মানিত রাসূল বা দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল বা দূত, তাঁর পক্ষ থেকে শরী‘আত প্রচারক।[৮৭]

দ্বিতীয়ত: সালাত[৮৮]: সালাত হচ্ছে, ইসলামের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ। বরং ইসলামের মেরুদণ্ড। বান্দা ও রবের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। আল্লাহর বান্দাগণ প্রত্যেকে দিনে তা পাঁচবার আদায় করে থাকে। এর মাধ্যমে সে তার ঈমানকে নবায়ন করে এবং স্বীয় আত্মাকে পাপের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র করে, অন্যায়-পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। সুতরাং আল্লাহর বান্দা যখন

ভোরে ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং তুচ্ছ পার্থিব দুনিয়ার কাজ কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে তাঁর রবের সামনে দণ্ডায়মান হয়। অতঃপর “আল্লাহু আকবার” বলে তার প্রভুর বড়ত্ব ঘোষণা করে এবং তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি দিয়ে ও তাঁর নিকট সাহায্য ও হিদায়াত চায়। সাজদাহ, কিয়াম ও রুকুকারীর অবস্থায় তার ও তার রবের মাঝে দাসত্ব ও আনুগত্যের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা নবায়ন করে, প্রত্যেক দিন পাঁচবার তা আদায় করে। আর এই সালাত আদায়ের জন্য তার সালাতের জায়গা, কাপড়, শরীর, অন্তর পবিত্র হওয়া আবশ্যক। মুসলিম

ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের সাথে জামা‘আতের সাথে তা আদায় করবে, যারা সবাই আন্তরিকভাবে তাদের রবের অভিমুখী এবং যাদের চেহারা আল্লাহর ঘর কা‘বা পানে ফিরানো। সুতরাং এভাবে সালাত আদায় করলে সালাতকে তার পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম পন্থায় স্থাপন করা হবে, যেমনিভাবে আল্লাহর বন্দাগণ আল্লাহর ইবাদাত করে। যে ব্যক্তি এই ইবাদাতে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শামিল করল যেমন: মুখের কথা, দুই হাত, দুই পা ও মাথার কাজ-কর্ম, তাদের অনুভূতি এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যেকেই এই মহান ইবাদাত থেকে তার অংশ (নেকী) পাবে।

সুতরাং অনুভূতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তারাও তাদের এ থেকে নেকীর ভাগ পাবে। অন্তরও তার নেকীর ভাগ পাবে। আর সালাত যেসব বিষয়কে শামিল করেছে তা হলো: আল্লাহর গুণ, প্রশংসা, মহিমা, তাসবীহ, তাকবীর, সত্যের সাক্ষ্য, কুরআন তিলাওয়াত, মহাপরিচালক আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনয়ী বান্দার ন্যায় দাঁড়ানো, তারপর এই স্থানে তাঁর উদ্দেশ্যে হীন ও বিনয়ী হওয়া, তাঁর নৈকট্য অর্জন করা, আবার রুকু, সাজদাহ, বিনয়-নম্রতার সাথে বসা ইত্যাদি। তাঁর বড়ত্বের কাছে নতি স্বীকার ও তাঁর মর্যাদার কাছে নতি স্বীকার করার কারণে কখনও কখনও বান্দার অন্তর

ভেঙ্গে পড়ে, তার শরীর তাঁর জন্য নীচ হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বিনয়ী হয়। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ, এরপর তার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে সে তার সালাত সমাপ্ত করে।[৮৯]

তৃতীয়ত: যাকাত[৯০]: যাকাত হচ্ছে, ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ। ধনী মুসলিম ব্যক্তির ওপর তার মালের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এটা খুব সহজ একটি বিষয়। অতঃপর ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্য যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয তাদেরকে প্রদান করবে।

যাকাতরে যারা হকদার তাদরেকে খুশি মনে যাকাত প্রদান করা মুসলমি ব্যক্তরি জন্য ওয়াজবি। এর মাধ্যমে সে তার হকদারদরে খোটা দবিে না এবং কোন প্রকার কষ্টও দবিে না। অনুরূপ ওয়াজবি হলো, মুসলমি ব্যক্তি এটা প্রদান করবে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনরে জন্য। এর মাধ্যমে কোনো সৃষ্টজীবরে নকিট থকেে কোনো প্রকার কৃতজ্ঞতা বা প্রতদিান পাওয়ার ইচ্ছা করবে না। বরং তা প্রদান করবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দশ্যে, যাতে সুখ্যাতি অর্জন ও প্রদর্শনরে কোনো চহ্নি থাকবে না।

যাকাত প্রদানরে উদ্দশ্যে হচ্ছ: মালরে বরকত লাভ। ফকীর, মসিকীন, ও অভাবীদরে আত্মপ্রশান্তি এবং ভকি্ষার লাঞ্ছনা থকেে তাদরেকে অমুখাপকে্ষী করা। আর ধনীরা যদি তাদরেকে পরতি্যাগ করে তবে তারা ক্ষতি ও অভাবরে মধ্যে পড়ে যাব,ে এ থকেে তাদরে প্রতি দয়া করা। যাকাত প্রদানরে আরও উপকারতিা হলো, এর মাধ্যমে বদান্যতা, দানশীলতা, স্বার্থত্যাগ, ব্যয় ও অনুগ্রহ ইত্যাদি গুণে গুণান্বতি হওয়া যায় এবং কৃপণ, লোভী ও নীচ ইত্যাদি জাতীয় দোষনীয় চরতি্র থকেে বাঁচা যায়। এর মাধ্যমে মুসলমিদরে মাঝে সম্পর্ক জোরদার হয়। ধনীরা গরীবদরে অনুগ্রহ কর।ে

সুতরাং, যদি এই পরবর্তী বাস্তবায়ন করা হয়, তবে সমাজের মাঝে কোনো প্রকার নিঃস্ব ফকীর, নুয়ে পড়া ঋণগ্রস্ত এবং সম্বল-হারা বিপদগ্রস্ত মুসাফির রাস্তায় আটকা পড়ে থাকবে না।

চতুর্থত: সিয়াম: অর্থাৎ রমযান মাসের সিয়াম, যা ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে রোযাদার পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও এতদুভয়ের হুকুমে যা পড়ে তা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত পালনার্থে বর্জন করে এবং স্বীয় আত্মাকে তার কু-প্রবৃত্তির আমল থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ তা‘আলা সিয়ামকে

অসুস্থ, মুসাফিরি, গর্ভবতী, স্তন্যদানকারিনী, ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর ওপর হালকা করে দিয়েছেন। ফলে তাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা তাদের জন্য সঙ্গত হবে। এই মাসে মুসলিম তার আত্মাকে তার কু-প্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে, যার ফলে এই মহান ইবাদাত পালনের মাধ্যমে তার আত্মাকে পশুর সাদৃশ্য থেকে বের করে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের সাদৃশ্যের দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে সাওম পালনকারী এমন এক চিত্রের কথা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

করা ব্যতীত পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

সিয়াম অন্তরকে পুনর্জীবিত করে। আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত সৃষ্টি ও আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা পাওয়ার উৎসাহ দেয়। ধনীদেরকে ফকীর-মিসকীন এবং তাদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে তাদের অন্তর তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। তারা আল্লাহর যেসব নি'আমত ভোগ করছে তা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সিয়াম আত্মাকে পবিত্র করে এবং তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ

সকলে এই ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে যে, সুখে-দুঃখে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাদের ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেহেতু সমাজের সকলে পূর্ণ একমাস এই ইবাদাতের হিফাযতকারী ও স্বীয় প্রভুর অনুগত হয়ে অতিবাহিত করে। এসব কিছু তাকে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে যে, আল্লাহ তা‘আলা গোপন বিষয় ও যা লুকিয়ে রাখা হয় সবকিছু জানেন। আর মানুষকে একদিন তার প্রভুর সামনে অবশ্য অবশ্যই দণ্ডায়মান হতে হবে এবং তাকে তার

ছোটি-বড় সকল কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবনে।[৯১]

পঞ্চমত: হজ[৯২]: পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থতি বায়তুল্লাহলি হারাম (আল্লাহর সম্মানতি ঘর) কা‘বার হজব্রত পালন। যারা কা‘বা ঘর পর্যন্ত পরবিহনরে ব্যবস্থা অথবা তার পারশি্রমকি প্রদান এবং সখোনে যাওয়া আসার সময় তার সার্বকি প্রয়োজন মটোতে যে পরমিাণ অর্থ ব্যয় করা দরকার তার সামর্থ্য রাখে, ঐ সমস্ত প্রত্যকে ক্ষমতাবান, জ্ঞানবান, বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমি ব্যক্তরি ওপর তা ফরয। তবে শর্ত হলো যে, ব্যয়রে এই অর্থ, তার ভরণ

পোষণের দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের খাদ্য-খোরাক হতে অতিরিক্ত হতে হবে এবং সে যেন পথে তার জীবনের ব্যাপারে ও তার অনুপস্থিতিতে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে আশংকা-মুক্ত হয়। যাদের সে পর্যন্ত (কা‘বা ঘর) যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে তাদের ওপর জীবনে মাত্র একবারই হজ ফরয।

পাপের কালিমা থেকে আত্মাকে পবিত্র করার নিমিত্তে হজের ইচ্ছা পোষণকারীকে আল্লাহর নিকট তাওবা করা উচিৎ। এরপর সে যখন মক্কা মুকার্রমা এবং হজের পবিত্র স্থানসমূহে পৌঁছবে তখন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত ও তাঁর সম্মানার্থে

হজরে কার্যাদি সম্পন্ন করবে। আর জনেে রাখবনে যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কা‘বা ও মাশায়রি অর্থাৎ হজরে অন্যান্য পবত্রি জায়গাসমূহ উপাস্য নয়, এগুলোর ইবাদাত করা যাবে না। বরং এগুলো কারো উপকার বা অপকার কছিুই করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা যদি ঐ সমস্ত জায়গাগুলোতে হজরে কার্য সম্পাদন করার নর্িদশে না দতিনে, তাহলে সখোনে গয়িে মুসলমিরে জন্য হজ করা বধৈ হত না।

হজে এসে হজ পালনকারী ব্যক্তি একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরধিান করে। অতঃপর সমগ্র পৃথবিীর বভিন্নি

দশে থকেে আগত মুসলমিরা একই স্থানে সমবতে হয়,ে একই ধরনরে কাপড় পরধিান কর,ে একই রবরে ইবাদাত করনে। যখোনে শাসক ও শাসতি, নতো ও অধীনস্থ, ধনী ও গরীব এবং সাদা ও কালোর মাঝে কোনো ভদোভদে নইে। সকলইে আল্লাহর সৃষ্টজীব ও তাঁর বান্দা। আর এ কারণইে একমাত্র তাকওয়া অর্জন বা আল্লাহভীতি ও সৎ আমল ব্যতীত একজন মুসলমি আরকেজন মুসলমিরে ওপর কোনোই প্রাধান্য নইে।

ফলে এক হয়ে হজ পালনরে মাধ্যমে মুসলমিদরে মাঝে পারস্পরকি সহযোগতিা ও পরচিতিরি পথ প্রসারতি

হয়। এর মাধ্যমে তারা সকলেই ঐ দিনকে স্মরণ করেন, যেদিন আল্লাহ তা‘আলা সকলকে পুনরুত্থিত করবেন এবং হিসাব-নিকাশের জন্য সবাইকে একই স্থানে একত্রিত করবেন। যার কারণে তারা আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[৯৩]

ইসলামে ইবাদাতের সংজ্ঞা[৯৪]

ইবাদাত হলো, অর্থগত ও প্রকৃতভাবে আল্লাহ তা‘আলার দাসত্ব বা আনুগত্য করা। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর আপনি সৃষ্ট, আল্লাহ আপনার উপাস্য আর আপনি তার বান্দা বা দাস। অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে এই পার্থিব

জীবনে আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতের অনুসারী হয়ে এবং তাঁর রাসূলের পদাঙ্ক অনুকরণের মাধ্যমে, তাঁর সোজা সরল পথের ওপর মানুষের চলা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য অনেক প্রকার মহান ইবাদাত প্রবর্তন করেছেন, যেমন- সমগ্র বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা‘আলার জন্যই তাওহীদ তথা একত্ববাদের বাস্তবায়ন, সালাত সুপ্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, সাওম পালন এবং হজ করা ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলামে শুধুমাত্র এগুলোই সব ইবাদাত নয়। বরং ইবাদাত হচ্ছে একটি ব্যাপক বিষয়, ফলে তা হচ্ছে- প্রত্যেক ঐ সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা এবং

কাজ যা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন। সুতরাং আপনার প্রতিটি কথা ও কাজ যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও যার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাই ইবাদাত। বরং প্রত্যেক ভালো স্বভাব যা আপনি আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের নিয়তে করেন সেগুলোই ইবাদাত। ফলে আপনি, আপনার পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ, স্ত্রী, সন্তানাদি এবং প্রতিবেশীর সাথে যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে, এর দ্বারা যদি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তাই ইবাদাত। এমনিভাবে আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার বা ইনসাফ, কষ্ট না দেয়া,

দুর্বলকে সাহায্য করা, হালাল উপার্জন, পরিবার ও সন্তানাদির ওপর ব্যয় করা, মিসকীনকে সহযোগিতা করা, রোগী পরিদর্শন করা, ক্ষুধার্তকে আহার দেয়া, মাযলুমকে সাহায্য করা এগুলো সবই ইবাদাত; যদি এগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন। অতএব প্রতিটি কাজ, যা আপনি আপনার নিজের জন্যে অথবা আপনার পরিবারের জন্য অথবা আপনার সমাজের জন্যে অথবা আপনার দেশের জন্যে করেন, যদি এর দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি আল্লাহ তা‘আলা আপনার জন্য যা বৈধ

করেছেন, সেই সীমারেখার মধ্যে আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করাটাও ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে , যদি তার সাথে সৎ নিয়ত সংযুক্ত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»

“তোমাদের কারোও স্ত্রী সহবাসেও সদকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কীভাবে হয় যে, আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জন করবো আর তাতে সাওয়াবও

রয়ছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বল তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে তার কি গুনাহ হবে না? অতএব সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তা হলে অবশ্যই সাওয়াব হবে।”[৯৫]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»

“প্রত্যেক মুসলিমকেই নিজ পক্ষ থেকে সদকা দিতে হবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! যদি কেউ সদকা দেয়ার মতো কিছু না পায়? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সদকা দিবে। সাহাবীগণ বললেন: যদি সে তা করতে না পারে? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তখন সে একজন দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে সহযোগিতা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কেউ আবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: যদি সে তা করতে না পারে? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললনে, তখন সে সৎ বা ভালো কাজরে আদশে দবি। সাহাবীগণ বললনে, যদি সে তা করতে না পারে? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে, তখন সে খারাপ কাজ থকেে বরিত থাকব, ফলে সটোই তার জন্য সদকা হব।” [৯৬]

দীনরে দ্বতিীয় স্তর: ঈমান[৯৭]

ঈমানরে রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি। যথা- আল্লাহ, তাঁর ফরিশিতাগণ, তাঁর কতিাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শষে দবিস ও তাকদীররে প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

প্রথমত: আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের (প্রভুত্বের) প্রতি এ ঈমান আনয়ন করবে যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জিনিসের রব, সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও পরিচালক এবং তাঁর উলুহিয়্যাতের (ইবাদাতের) প্রতি ঈমান আনয়ন করবে যে, তিনিই সত্য উপাস্য, তিনি ব্যতীত আর সব উপাস্য বাতিল বা অসত্য। তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনয়ন করবে যে, তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং পরিপূর্ণ ও সুউচ্চ গুণাবলি রয়েছে।

আর এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে যে, তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব), উলুহিয়্যাত (ইবাদাত) এবং নাম ও

গুণাবলির ব্যাপারে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥﴾ [مريم: ٦٥]

“তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবারই রব। সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদাত করো এবং তাঁরই ইবাদাতে প্রতিষ্ঠিত থাকো; তুমি কি তাঁর সমতুল্য আর কাউকে জান?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৫]

আরও ঈমান আনয়ন করবে যে, তাঁকে তন্দ্রা ও ঘুম স্পর্শ করে না, তিনি প্রকাশ্য ও অদৃশ্যের সকল বিষয়ের

জ্ঞান রাখেন এবং তিনি হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ [الانعام:٥٩]

“অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ থেকে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনিভাবে যেকোনো সিক্ত ও

শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৯]

আরও ঈমান আনয়ন করবে যে, তিনি সুউচ্চ ‘আরশের উপরে, সকল সৃষ্টিকুলের উপরে রয়েছেন। তবে তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে রয়েছেন এভাবে যে, তিনি তাদের সর্বাবস্থা অবগত রয়েছেন, তাদের সব ধরনের কথাবার্তা শ্রবণ করেন, তাদের অবস্থানসমূহ দেখেন, তাদের যাবতীয় কর্মসমূহ পরিচালনা করেন, দরিদ্রকে আহার দেন, ব্যর্থকে আশ্রয় দেন, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব

করে নেন, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর সর্বশক্তিমান।[৯৮]

আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের কতিপয় ফলাফল:

(১) আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্মান এমন বান্দার উপকারে আসবে যারা তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে সাড়া দানকারী। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এগুলো পালন করে, তবে সে এর কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ সৌভাগ্য ও কল্যাণ অর্জন করবে।

(২) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন অন্তরে সম্মান ও গৌরব সৃষ্টি করে। কারণ সে জানে যে, এই বিশ্বজাহানে যা

কিছু রয়েছে তার সব কিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপকারকারী ও অপকারকারী নেই।

এই জ্ঞান তাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের হতে অমুখাপেক্ষী করবে এবং তিনি ছাড়া অন্যের ভয়কে তার অন্তর হতে দূর করবে। ফলে সে তখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট আশা করবে না এবং তিনি ছাড়া আর কাউকে ভয়ও করবে না।

(৩) আল্লাহর প্রতি ঈমান তার অন্তরে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করবে। কারণ সে জানে যে, সে যেসব নি'আমত ভোগ করছে তা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ

থেকে। সুতরাং শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলতে পারে না, তাই সে অহংকার ও গর্ব করে না এবং সে তার শক্তি ও অর্থের বড়াইও করে না।

(৪) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এটা দৃঢ়ভাবে অবগত রয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা রাযী ও খুশি হন এমন সৎ আমল ছাড়া সাফল্য ও মুক্তি অর্জনের আর কোন পথ নেই। অথচ অন্যরা বিভিন্ন ধরনের বাতিল বিশ্বাস পোষণ করে যেমন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অপরাধ মার্জনা করার জন্য তার ছেলেকে শূলের আদেশ দেন (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। অথবা আল্লাহ ছাড়া এমন উপাস্যের প্রতি

ঈমান আনয়ন করে এবং এই মত পোষণ করে যে, সে তার চাহিদা পূরণ করে দিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কোনোই উপকার ও অপকার করবে না অথবা নাস্তিক (অবিশ্বাসী) হবে; ফলে সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিবে না। এগুলো সবই হলো ভ্রান্তদের ধারণা মাত্র। অবশেষে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে এবং প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে, তখন বুঝতে পারবে যে, তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

(৫) আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষের অন্তরে সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা, ধৈর্য, অবিচলতা, ও তাওয়াককুলের মহান

শক্তি তখনই বৃদ্ধি করবে, যখন সে দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব মহান কাজের দায়িত্ব পালন করবে এবং তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে যে, সে আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিকের ওপর নির্ভরশীল। তিনিই তাকে সাহায্য করবেন ও তার হাতকে শক্তিশালী করবেন। সুতরাং সে তার ধৈর্য, অবিচলতা ও তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে শক্ত পাহাড়ের মতো মজবুত হবে।[৯৯]

দ্বিতীয়ত: ফিরিশিতাগণের ওপর ঈমান

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আনুগত্য করার জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি

তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে তারা হচ্ছে:

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۚ بَلۡ عِبَادٞ
مُّكۡرَمُونَ ٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ
يَعۡمَلُونَ ٢٧ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا
يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ
٢٨﴾ [الانبياء: ٢٦، ٢٨]

“আর তারা বলে, ‘দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের

প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৬-২৮]

আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ ٢٠﴾ [الانبياء: ١٩، ٢٠]

“তারা অহংকার বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিবোধ করে না, রাতদিন ইবাদাত করে সামান্যও ক্লান্ত হয় না।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১৯-২০] আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে আমাদের দর্শন থেকে আড়াল করে রেখেছেন। যার ফলে

আমরা তাদেরকে দেখেতে পায় না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কখনও কখনও আবার কিছু নবী ও রাসূলদেরে জন্য তাদেরে কাউকে (স্ব-আকৃততিে) প্রকাশ করছেনে।

ফিরিশিতাদেরেকে বিভিন্ন প্রকার কর্মরে দায়ত্বি দেয়ো হয়ছে।ে যমেন অহী অবতরণরে দায়ত্বিপ্রাপ্ত জবিরীল ‘আলাইহসি সালাম, তিনি আল্লাহর নকিট হতে অহী নয়িে আল্লাহ তাঁর বান্দাদরে মধ্যে যাকে রাসূল নযিুক্ত করছেনে তার নকিট অবতরণ করনে। কউে সমস্ত জান কবজ করার দায়ত্বিপ্রাপ্ত। কছিু ফিরিশিতা মাতৃগর্ভরে সন্তান বা ভ্রূণরে

কাজে নিয়োজিত। কেউ আদম সন্তানের হিফাযতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার কেউ তাদের সকল প্রকার কর্ম লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দু’জন ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨﴾ [ق: ١٧، ١٨]

“তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবিদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবিদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।” [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৭, ১৮][১০০]

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান স্থাপনের কিছু উপকারিতা:

(১) শির্ক ও তার কলঙ্কের কালিমা হতে মুসলিমের আকীদাহ-বিশ্বাস পবিত্র হয়। কারণ মুসলিম যদি ফেরেশতাদের অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করে তবে সে এ বিশ্বাস থেকে বেঁচে যাবে যে, এমন কিছু কাল্পনিক (ওলী-আউলিয়া) সৃষ্টজীব বিদ্যমান রয়েছে যারা এই বিশ্ব পরিচালনায় (আল্লাহর) অংশীদার।

(২) মুসলিম এটা জানবে যে, ফেরেশতারা উপকারও করে না, অপকারও করে না। বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন

তারা তা অমান্য করেনে না এবং তাদরেকে যা করার আদশে দয়ো হয় তারা তাই করনে। সুতরাং তাদরে ইবাদাত করা যাবে না, তাদরে অভমিুখী (বপিদে-আপদে) হওয়া যাবে না, তাদরে সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত: আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী কতিাবসমূহরে ওপর ঈমান

তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতা বর্ণনা করার জন্য ও তাঁর দকিে মানুষকে আহ্বানরে জন্যে স্বীয় নবী ও রাসূলগণরে প্রত অিসংখ্য কতিাব অবতীর্ণ করছেনে। যমেন আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ ٢٥﴾ [الحديد: ٢٥]

“নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫]

এ সমস্ত কিতাবের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সহীফা, মূসা ‘আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছিল তাওরাত, দাউদ ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল যাবূর এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল ইঞ্জিল। সুতরাং

এসব পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণের প্রতি এগুলো অবতীর্ণ করেছেন আপনি তা বিশ্বাস করেছেন। আর শরী‘আত এগুলোকে ঐসব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত করেছে যা আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছা সেই সময়ে করেছিলেন। আর যে সমস্ত কিতাবের সংবাদ আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন তার সবই (কালের পরিবর্তনে) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সহীফার কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। পক্ষান্তরে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর

ইত্যাদি, নামে মাত্র ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের নিকট পাওয়া গেলেও এগুলো বিকৃত ও পরিবর্তন করা হয়েছে, এর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, এর মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করেছে যা আদৌ তাতে ছিল না, বরং তা এমন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত যার প্রকৃত অধিকারী সে নয়। যেমন- “আহদুল ক্বাদীম” (বাইবেলের পুরাতন টেস্টামেন্ট) এর মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি ‘সিফির’ রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি মূসা ‘আলাইহিস সালাম এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়, তা হলো, মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” যা তিনি

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যা আজও স্বয়ং আল্লাহর হিফাযতে সু-সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। (আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে) আজ পর্যন্ত এর একটি অক্ষর, বা একটি শব্দ, বা একটি হরকত অথবা এর অর্থের মাঝে কোন পরিবর্তন বা বিকৃত হয়নি।

আল-কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাঝে পার্থক্যের অনেক কারণ রয়েছে! এর কিছু নিম্নে আলোকপাত করা হল:

(১) পূর্ববর্তী এই কিতাবসমূহ মূলত বিলীন হয়ে গেছে ও এর মাঝে পরিবর্তন

হয়েছে, এগুলোকে প্রকৃত অধিকারীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত না করে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর সাথে অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা, টীকা বা মন্তব্য ও তাফসীরকে সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে এবং এমন সব (অহেতুক) বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা আল্লাহ প্রদত্ত অহী, যুক্তি এবং অনেক জিনিসের প্রকৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” ঠিক ঐভাবেই স্বয়ং আল্লাহর হিফাযতে সু-সংরক্ষিত রয়েছে, যে অক্ষর ও শব্দের সাথে আল্লাহ তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। যাতে

কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংযোজিত হয়নি। বরং মুসলিমগণও চান যে, কুরআন সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে বিশুদ্ধভাবে অবশিষ্ট থাক। ফলে তারা একে অন্য কিছুর সাথে কখনও মিলিয়ে ফেলেননি। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত, সাহাবীগণের জীবন-চরিত, কুরআনের তাফসীর অথবা ইবাদাত ও লেনদেনের হুকুম-আহকাম ইত্যাদি (কোনো কিছুর সাথেই কুরআনকে মিলিয়ে দেননি)।

(২) বর্তমানে পুরাতন কিতাবসমূহের কোনো ঐতিহাসিক সনদ (সূত্র বা প্রমাণপত্র) জানা যায় না। বরং

কিছু তো এমন রয়েছে, যা কার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন ভাষায় লেখা হয়েছে তাও জানা যায় না। উপরন্তু এর কিছু প্রকার এমনও রয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক করা হয় ঐ ব্যক্তির সাথে, যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়নি।[১০১]

কিন্তু কুরআনে কারীম, মুসলিমরা তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে মুতাওয়াতির "অবিচ্ছিন্ন সূত্র অগণিত অসংখ্য মাধ্যমে" মৌখিক ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে লাভ করেছে"। মুসলিমদের মাঝে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক নগরে এই মহাগ্রন্থ "আল-কুরআনের হাজার

হাজার হাফিয এবং হাজার হাজার এর লিখিত কপি বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে লিখিত কপির সাথে যদি মৌখিক অনুলিপির মিল না হয়, তাহলে বিপরীত বা ভিন্ন কপিটিকে গণ্য করা হয় না। সুতরাং লেখার আকৃতিতে (মাসহাফে) যা রয়েছে তার সাথে মানুষের সীনাতে যা মুখস্থ আছে তার হুবহু মিল অবশ্যই থাকতে হবে। এর চেয়ে বড় কথা হলো যে, কুরআনকে মৌখিকভাবে (মুখস্থ করে) যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো কিতাবের সৌভাগ্য এমন হয়নি। বরং উম্মতে মুহাম্মাদী ছাড়া আর কোনো জাতির মাঝে এই নকল বা বর্ণনা পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কুরআন পাঠ-পঠন ও বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতি: ছাত্র শিক্ষককে না দেখে মুখস্থ পাঠ করে শুনাবে। শিক্ষক মহোদয় তাঁর শিক্ষকের নিকট এমনিভাবে মুখস্থ শুনিয়েছিলেন। এভাবে শিক্ষককে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ শুনানোর শেষে, শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন তাকে “ইজাযাহ” বলা হয়। এই সার্টিফিকেটের মধ্যে শিক্ষক যে প্রত্যায়ন করেন তা হচ্ছে: তার ছাত্র তাঁকে ঠিক ঐ ভাবেই কুরআন মুখস্থ শোনায়, যেভাবে তিনি তাঁর শিক্ষককে শুনিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সূত্র পৌঁছা পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই তাদের স্বীয়

শাইখ বা শিক্ষক মহোদয়ের নাম উল্লেখ করেন। এভাবে একজন ছাত্র থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মৌখিক সূত্রের ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়। তেমনিভাবে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত ও সূরা, কোথায় এবং কখন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে? এর পরিচয়ের জন্য সূত্রের সাথে অনেক ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এবং শক্তিশালী প্রমাণ পরস্পর সহযোগিতা করেছে।

(৩) পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা বহু যুগ পূর্বেই বিলীন হয়ে যায়। ফলে সেই ভাষায় কথা

বলার মত লোক পাওয়া যায় না। আর বর্তমান সময়ে খুব কমই লোক আছে যারা ঐ ভাষা বুঝে। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়, তা এক জীবন্ত ভাষা, যে ভাষায় এখন কোটি কোটি মানুষ কথা বলছে। আর যদিও কেউ ঐ ভাষা শিক্ষাগ্রহণ না করে, তবুও কুরআনের অর্থ বুঝে এ ধরনের লোক আপনি প্রত্যেক জায়গায় পাবেন।

(৪) পুরাতন কিতাবগুলো নির্দিষ্ট একটি যুগের জন্য ছিল। আর তা সকল মানুষ নয় বরং একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত ছিল। এই কারণে কিছু বিধি-বিধানকে সেই যুগে, ঐ জাতির

জন্য নির্ধারিতভাবে শামিল করা হয়েছিল। যদি এমনই হয় তাহলে তা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য উপযোগী হবে না। অপরদিকে মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” এমন একটি কিতাব যা সর্বযুগে, সকল জায়গার মানুষের জন্য উপযোগী। আর তা এমন বিধিবিধান, লেনদেন ও আখলাক বা শিষ্টাচারকে শামিল করেছে, যা সর্বযুগে, সকল জাতির জন্য উপযুক্ত। কারণ এর সকল বক্তব্য সকল মানুষের জন্য নির্দেশিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে, যে সমস্ত কিতাবের মূল কপি পাওয়া যায় না, ঐ সমস্ত কিতাবের

মাধ্যমে মানুষের ওপর আল্লাহর প্রমাণ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে ভাষায় লেখা হয়েছিল তা বিকৃত হওয়ার পর, ঐ ভাষায় কেউ কথা বলবে এমন কোনো লোকও পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ওপর আল্লাহর প্রমাণ সাব্যস্ত হবে এমন কিতাবের মাধ্যমে, যে কিতাব সু-সংরক্ষিত এবং সকল প্রকার বিকৃতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অতিরিক্ত কোনো কিছু হতে মুক্ত। যার কপি সকল জায়গায় ছড়ানো (অর্থাৎ যেকোনো জায়গায় তা পাওয়া যায়)। যা এমন এক জীবন্ত ভাষায় লিখিত, কোটি কোটি মানুষ তা পাঠ করে এবং মানুষের নিকট আল্লাহর

বার্তা প্রচার করে। এই কিতাবটি হলো: মহাগ্রন্থ “আল-কুরআনুল আযীম” যা আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেন। তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক এবং বিকৃত হওয়ার পূর্বে এগুলোর সত্যায়নকারী ও সাক্ষী। অতএব সমগ্র মানবজাতির এরই অনুসরণ করা ওয়াজিব। যাতে করে তা তাদের জন্য আলোকবর্তিকা, যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, হিদায়াত ও রহমত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥﴾ [الانعام: ١٥٥]

“আর আমরা এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময় ও কল্যাণময়! সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর আর (আল্লাহকে) ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ١٥٨﴾ [الأعراف: ١٥٧]

“(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন: হে মানব! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

চতুর্থত: নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান

আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টজীব (জিন্ন ও ইনসানের নিকট) অসংখ্য নবী-রাসূল বা দূত প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে ও রাসূলগণকে সত্য মনে করে, তাদেরকে তারা জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সু-সংবাদ দেন, আর যদি অবাধ্য হয় তবে তাদেরকে তারা জাহান্নামের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত

করবে এবং তাগুতকে পূজা বর্জন করবে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ [النساء : ١٦٥]

“এই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন এই রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫]

এই রাসূলদের সংখ্যা অনেক। প্রথম রাসূল নূহ ‘আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদরে কারোও কারোও সংবাদ আল্লাহ আমাদরেকে জানয়িছেনে যমেন- ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম, মূসা ‘আলাইহিস সালাম, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম, দাউদ ‘আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম, যাকারয়িা ‘আলাইহিস সালাম এবং সালহি ‘আলাইহিস সালাম। আবার কারোও সম্পর্কে কোনো কছিুই উল্লখে করনেনি। আল্লাহ তা‘আলা বলনে,

﴿وَرُسُلٗا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর অনকে রাসূল, যাদরে বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দয়িছেি এবং

অনকে রাসূল, যাদরে বর্ণনা আমরা আপনাকে দইেনি।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত:১৬৪]

রাসুলগণ সবাই আল্লাহর সৃজতি মানুষ। তাদরে কারোও মধ্যে রুবুবয়্যিাতরে (প্রভুত্বরে) এবং উলুহয়্যিাতরে (উপাস্যরে) কোনো বশৈষি্ট্য নইে। সুতরাং ইবাদাতরে কোনো কছিুই তাদরে জন্য করা যাবে না। তারা তাদরে নজিদেরে কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যমেন, আল্লাহ তা‘আলা প্রথম রাসূল নূহ ‘আলাইহসি সালাম সম্পর্কে বলনে য,ে তনি তার জাতকিে উদ্দশ্যে করে বলনে,

﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٞ﴾ [هود: ٣١]

“আর আমি তোমাদেরকে একথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি (একথা বলছি না যে আমি) অদৃশ্যের কথা জানি। আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা।” [সূরা হূদ, আয়াত:৩১]

আর আল্লাহ তা‘আলা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে একথা বলার জন্য আদেশ করেন যে,

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ ٥٠﴾ [الانعام: ٥٠]

“আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ধন-ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের কোনো জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫০]

আর তিনি আরও বলেন,

﴿قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٧]

“(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন- আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে

আমার কোনো ক্ষমতা নেই। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৭]

সুতরাং নবীগণ হলেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচন করেছেন এবং রিসালাতের মহান দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর দাসত্ব বা আনুগত্যের গুণে তাদেরকে গুণান্বিত করেছেন। তাদের সবার দীন হলো ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত আর কোনো দীনই আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন হলো ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

মৌলিকভাবে তাদের সবার রিসালাত ছিল এক ও অভিন্ন কিন্তু তাদের শরী‘আত ছিল আলাদা আলাদা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾ [المائدة: ٤٨]

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা নির্দিষ্ট শরী‘আত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৮]

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী‘আতের মাধ্যমে

পূর্ববর্তী সকল শরী'আতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে তা পূর্ববর্তী সকল শরী'আতের রহিতকারী। আর তাঁর রিসালাতও সকল রিসালাতের পরিসমাপ্তকারী। আর তিনি হচ্ছেন খাতামুল আম্বিয়া বা রাসূলগণের পরিসমাপ্তিকারী।

সুতরাং যে ব্যক্তি একজন নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তার ওপর সকল নবীদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি একজন নবীকে মিথ্যা মনে করে, সে যেন সকল নবী ও রাসূলকেই মিথ্যা মনে করল। কারণ, সকল নবী ও রাসূলগণই আল্লাহর প্রতি, তার ফিরিশতাদের প্রতি, তার

কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান স্থাপনের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। আরও কারণ হলো তাদের সবার দীন এক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মাঝে পার্থক্য করবে অথবা তাদের কারোও প্রতি ঈমান আনবে আর কাউকে অস্বীকার করবে, সে যেন তাদের সবাইকে অস্বীকার করল। কারণ তাদের প্রত্যেকেই সমস্ত নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান স্থাপনের আহ্বান করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

“(আল্লাহর) রাসূল তাঁর রব হতে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও; তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফিরিশতাগণের ওপর, তার কিতাবসমূহের ওপর এবং তার রাসুলগণের ওপর। আমরা তার রাসুলগণের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠﴾ [النساء : ١٥٠]

“নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে যে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি আর কতিপয়কে অস্বীকার করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা পোষণ করে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫০]

পঞ্চমত: কিয়ামত বা শেষ দিবসের ওপর ঈমান

দুনিয়ার সকল সৃষ্টজীবের শেষ হলো মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের গন্তব্য কোথায়? পৃথিবীতে শাস্তি পাওয়া থেকে যারা বেঁচে গেছে তার

অত্যাচারেরে পরিণাম কী? তারা কি তাদেরে যুলুম নির্যাতনেরে শাস্তি ভোগ করা হতে রক্ষা পেয়ে যাবে? নেককারগণেরে (সাওয়াবেরে) যে অংশ ছুটে গেছে এবং দুনিয়ায় তাদেরে ইহসানেরে প্রতিদান অর্থাৎ নেকী কি বিনষ্ট হয়ে যাবে? মানবজাতিরি এক প্রজন্মেরে পর আরেকে প্রজন্ম পর্যায়ক্রমে মারা যাচ্ছে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবী ধ্বংসেরে আদেশে দিবেনে এবং পৃথিবীর বুক থেকে সকল সৃষ্টিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলকে কিয়ামতেরে দিনি পুনরুত্থিতি করবেনে এবং তাদেরে পূর্বেরে ও পরেরে সকলকে একত্রিতি করবেনে। অতঃপর ভালো ও মন্দ যে

কর্মই বান্দাগণ দুনিয়াতে করেছে তার হিসাব নেবেন। তারপর মুমিনগণকে (সসম্মানে) জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, আর কাফিরদেরকে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

জান্নাত হলো সেই পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার নি'আমত রয়েছে তার বর্ণনা কেউ দিতে সক্ষম হবে না। সেখানে একশত স্তর রয়েছে। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ও তাদের আনুগত্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের অধিকারী যেখানে অবস্থান

করবে। আর জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসীকে ঐ নি‘আমত দেয়া হবে যেমন দুনিয়ার কোনো বাদশাহ উপভোগ করে; বরং তার চেয়ে দশগুণ বেশি।

আর জাহান্নাম সেই শাস্তির জায়গা, যা আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে; তার আলোচনা অন্তরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। আখেরাতে আল্লাহ যদি কাউকে মৃত্যুবরণ করার অনুমতি দিতেন, তাহলে জাহান্নামীরা শুধুমাত্র এর অবস্থা দেখেই মারা যেত। প্রতিটি মানুষ যা

বলবে বা করবে, তা ভালো হোক, মন্দ হোক, প্রকাশ্য হোক, অপ্রকাশ্য হোক; সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞান থেকেই জানেন। তারপরেও তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দু‘জন ফিরিশতাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাদের একজন ভালো আমল আর অন্যজন খারাপ আমল লিখবেন। তাদের থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾ [ق: ١٨]

“মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী (ফিরিশতা) তার নিকটেই রয়েছে।” [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৮]

আর এই সব আমল বা কৃতকর্ম যে দফতরে লেখো হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মানুষকে তা দেয়া হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩﴾ [الكهف: ٤٩]

“আর সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবিদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরে দেখেবেন আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে! হায়, আমাদেরে আফসোস! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি বরং সমস্ত

কিছু হিসাব (লিপিবিদ্ধ করে) রেখেছে; তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখেই উপস্থিত পাবে; আর আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

অতঃপর তারা তা পড়বে, কিন্তু এ থেকে কোনো কিছুকে অস্বীকার করবে না। যদি কেউ কোনো কিছু অস্বীকার করে, তাহলে তার কান, চক্ষু, দুই হাত ও পা এবং চামড়া যা যা করেছে, আল্লাহ সেসব কর্ম সম্পর্কে সকল কথা বলাবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ١٩
حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأَبۡصَٰرُهُمۡ
وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢٠ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمۡ لِمَ

شَهِدتُّمۡ عَلَيۡنَاۖ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيۡءٖ
وَهُوَ خَلَقَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢١ وَمَا كُنتُمۡ
تَسۡتَتِرُونَ أَن يَشۡهَدَ عَلَيۡكُمۡ سَمۡعُكُمۡ وَلَآ أَبۡصَٰرُكُمۡ وَلَا
جُلُودُكُمۡ وَلَٰكِن ظَنَنتُمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعۡلَمُ كَثِيرٗا مِّمَّا
تَعۡمَلُونَ ٢٢ ﴾ [فصلت: ١٩، ٢٢]

“আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। আর তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে বলবে, ‘কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ্ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি

সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।’ ‘আর তোমরা কিছুই গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না--- বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১৯-২২]

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান তথা কিয়ামত, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন দিবসের প্রতি ঈমান রাখার নির্দেশনা সকল নবী ও

রাসূল নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلۡأَرۡضَ خَٰشِعَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩﴾ [فصلت: ٣٩]

“আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক, অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰۚ﴾ [الاحقاف: ٣٣]

“তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম।” [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ৩৩]

আর এগুলোর মধ্যে আল্লাহর হিকমত যে দাবী করে, তা হলো: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টজীবকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে নিরর্থক ছেড়েও দেননি। বরং সবচেয়ে কম বুদ্ধির মানুষটির পক্ষেও সম্ভব নয়

যে, সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া ও তার বিনা ইচ্ছায় কোনো কাজ করবে। সুতরাং মানুষ এই জিনিসটি কেন খেয়াল করে না যে, এই অবস্থা যদি মানুষের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তারা তার প্রভু সম্পর্কে এ ধারণা কীভাবে করে যে, তিনি সৃষ্টজীবকে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দিয়েছেন? আল্লাহ সম্পর্কে তারা যা বলে, তা হতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে ও মহান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ١١٥﴾ [المؤمنون: ١١٥]

“তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি

এবং তোমরা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?” [সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১১৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧﴾ [ص : ٢٧]

“আমরা আসমানসমূহ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৭]

সকল জ্ঞানবান মানুষই কিয়ামত দিবসের বিশ্বাসের প্রতি সাক্ষ্য দেয়। আর এটা যুক্তিরও দাবী এবং সঠিক ফিতরাত বা স্বভাবও তা মেনে নেয়। কারণ মানুষ যখন কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখে তখন মানুষ যা ছেড়ে দেয় তা কেন ছেড়ে দেয় এবং যা আমল করে তা যে কেবল আল্লাহর নিকট থেকে নি'আমত পাওয়ার আশায় করে, তা সে বুঝতে পারবে। আরও বুঝতে পারব যে, যখন কেউ মানুষের ওপর যুলুম করে, সে অবশ্যই তার প্রতিফল পাবে, আর তার থেকে কিয়ামতের দিন সেটার বদলা নিবে। আর যদি সে ভাল আমল করে, তবে ভালো প্রতিদান পাবে। আর যদি খারাপ আমল করে, তবে

প্রতিদানও খারাপ পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাই পুরষ্কার দেয়া হবে, যা সে চেষ্টা করেছে এবং এভাবেই আল্লাহর আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾ [الزلزلة: ٧،٩]

“সুতরাং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎ আমল করবে সে তা দেখবে এবং যে বিন্দু পরিমাণ অসৎ আমল করবে সে তাই দেখবে।” [সূরা যিলযাল, আয়াত: ৭,৯][১০২]

আর কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহর সৃষ্টজীবের কেউ জানে না। সুতরাং তা

এমন একটি দিন, যা আল্লাহর কোনো প্রেরিত নবী ও রাসূল এবং কোনো সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাও সেদিন সম্পর্কে কিছুই জানে না। বরং তা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর জ্ঞানের সাথেই নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَاۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّيۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَۚ ١٨٧ ﴾ [الاعراف: ١٨٦]

“(হে মুহাম্মাদ)! তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন: এ বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আমার রবের নিকটেই রয়েছে। তিনিই এর নির্ধারিত

সময়ে প্রকাশ করবেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]

“নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ৩৪]

ষষ্ঠত: তাকদীর বা ভাগ্যের ওপর ঈমান

এ স্বীকৃতি প্রদান করবেন যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমান বা ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে বা হবে, তার সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলার জানা আছে। তিনি তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা,

কর্মকাণ্ড, মৃত্যু, সময় এবং রিযিক সম্পর্কে সবকিছু জানেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾ [العنكبوت: ٦٢]

“নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ٥٩﴾ [الانعام:٥٩]

“অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে

না। আর স্থলে ও জলভাগে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনিভাবে যেকোনো সিক্ত ও শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেনে, সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবিদ্ধ রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৯]

আর এই জানা জিনিসকে তিনি তাঁর নিকট লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ﴾ [يس: ١٢]

“আর আমরা প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ১২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠﴾ [الحج: ٧٠]

“আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তার সবকিছুই জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আর এটি আল্লাহর কাছে খুবই সহজ।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭০]

ফলে আল্লাহ তা‘আলা যখনই কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু তার জন্য বলেন, হও, আর তা হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]

“নিশ্চয় তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, হও, ফলে তা হয়ে যায়।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮২]

আল্লাহ তা‘আলা যেমন প্রত্যেকটি জিনিসের (তাকদীর) নির্ধারণ করেছেন, তেমনি প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টাও তিনি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ﴾ [القمر: ٤٩]

“নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।” [সূরা আল-ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ﴾ [الزمر: ٦١]

“আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২]

তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁরই আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আনুগত্য কী তাদেরকে তাও বর্ণনা করেছেন। এই আনুগত্য করতে তাদেরে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। অবাধ্যতা কী তাও তাদেরকে

বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদেরকে সামর্থ্য ও ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন, যাতে করে তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দিয়ে সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করবে,সে শাস্তির উপযোগী হবে।

মানুষ আল্লাহর ফায়সালা ও তকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে যে উপকার লাভ করবে তা নিম্নরূপ:

(১) কারণ বা উদ্দেশ্য নির্বাচন করার সময় আল্লাহর ওপর তার আস্থা হবে। কেননা সে জানে যে, উদ্দেশ্য ও ফলাফল উভয়ই আল্লাহর হুকুম ও তকদীর অনুযায়ী হয়।

(২) মানসিক শান্তি ও আত্মতৃপ্তি লাভ হবে। কারণ যখনই সে জানবে যে, এসব আল্লাহর হুকুম ও তাকদীর অনুযায়ী এবং নিয়তি-নির্ধারিত অ-পছন্দনীয় যা নিশ্চিতরূপে হবেই, তখন তার আত্মতৃপ্তি হবে এবং আল্লাহর ফায়সালার (তাকদীরের) প্রতি সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং যে তাকদীরের ওপর ঈমান রাখে, তার চাইতে সর্বোত্তম জীবন-যাপনকারী, সুখকর মন ও অধিক শক্তিশালী শান্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই।

(৩) উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জনের সময় মনের অহমিকামূলক আনন্দ দূর করবে। কেননা তা অর্জন কল্যাণ ও সফলতা

লাভরে উপায়সমূহরে অন্তর্গত আল্লাহর এমন একটি নি‘আমত যা তনিি তার জন্য নর্িধারণ করছেনে। ফলে সে এই ব্যাপারে আল্লাহর শুকরয়িা আদায় করব।ে

(৪) উদ্দষি্ট বস্তু হাত ছাড়া হওয়া অথবা অ-পছন্দনীয় বস্তুতে পতিত হওয়ার সময় অসন্তোষ ও মনঃকষ্টকে বদিূরতি করব।ে কারণ এসব কছিু আল্লাহর হুকুমে হয়, যার হুকুমরে কউে বাধাদানকারী ও নবিারণকারী নইে। তাতো নশ্চিতিরূপে হবইে। অতএব, সে ধরৈ্যধারণ করে ও আল্লাহর কাছে সাওয়াবরে আশা কর।ে আল্লাহ তা‘আলা বলনে,

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ
إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ
يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ
بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣﴾
[الحديد: ٢٢، ٢٣]

“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদই আসে আমরা তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা একটি কিতাবে লিপিবিদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছে তাতে যেন তোমরা হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্যে গৌরবে ফেটে না পড়। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে

পছন্দ করেন না।” [সূরা হাদীদ, আয়াত: ২২, ২৩][১০৩]

(৫) আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা স্থাপিত হবে। কারণ মুসলিম জানে যে, উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। সুতরাং সে কোনো শক্তিধর ব্যক্তিকে ভয় করবে না এবং কোনো মানুষের ভয়ে কোনো মঙ্গলজনক কর্ম করতে অবহেলাও করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে লক্ষ্য করে বলেন:

«وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ»

“জেনে রাখবে যে, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না; আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”[১০৪]

দীনের তৃতীয় স্তর: ইহসান

ইহসান এর একটিমাত্র রোকন বা স্তম্ভ, আর তা হচ্ছে: আপনি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবেন, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি এমনটি মনে করা সম্ভব না হয়, তবে একথা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় তিনিই আপনাকে দেখছেন। অতএব, এই পদ্ধতিতে মানুষ তার রবের ইবাদাত করবে। এটা হচ্ছে তাঁর নিকটে ও তাঁর সামনে নিজেকে উপস্থিত করা। আর তা আল্লাহর ভয়, প্রভাব ও শ্রদ্ধাকে অপরিহার্য করবে এবং তা ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতাকে এবং ইবাদাতকে পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য চেষ্টা করাকেও অপরিহার্য করবে।

সুতরাং ইবাদাত করার সময় বান্দা তাঁর প্রভুকে স্মরণ করবে এবং নিজেকে এমনভাবে তাঁর নিকট উপস্থিত করবে যেন সে তাঁকে দেখছে। কিন্তু যদি তার পক্ষে এটা অনুধাবন করা সম্ভব না হয়, তবে তা বাস্তবায়ন করার জন্য সে যেন আল্লাহর ওপর ঈমানের সাহায্য চায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে দেখছেন। তিনি তার গোপন, প্রকাশ্য, ভিতর, বাহির সব বিষয় জানেন। তার কর্মকাণ্ডের কোনো কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।[১০৫]

অতএব, আল্লাহর যে বান্দা এই অবস্থানে পৌঁছে, সে আন্তরিকভাবে তার প্রভুর ইবাদাত করে। আর তিনি

ব্যতীত আর কারো দিকে সে নজর দেয় না। ফলে সে কোনো মানুষের প্রশংসা শোনার অপেক্ষায় থাকে না এবং তাদের তিরস্কারকেও সে ভয় করে না। বরং তার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার প্রভু তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং স্বীয় বান্দার তিনি প্রশংসা করবেন। সুতরাং সে এমন একজন মানুষ যার গোপন ও প্রকাশ্য সমান এবং নির্জনে ও প্রকাশ্যে সে তার প্রভুর একজন ইবাদাতাকারী। সে এ ব্যাপারে পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসী যে, তার অন্তরে যা রয়েছে এবং তার আত্মা যা কুমন্ত্রণা দেয়, তার সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলা অবগত আছেন। ঈমান তার অন্তরকে প্রভাবিত করে এবং মনে করে যে, তার প্রভূ তাকে

পর্যবেক্ষণ করছেন। যার কারণে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে সে তার প্রভুর অনুগত বান্দা হয়ে এগুলো দ্বারা শুধুমাত্র এমন সব আমলই করে, যা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন, রবের কাছেই নিজেকে সমর্পন করে।

আর যখন তার অন্তর তার প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সে আর কোনো সৃষ্টিকুলের নিকট সাহায্য চায় না। কেননা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সে অন্যদের থেকে অভাব-মুক্ত হয়ে পড়ে। সে কোনো মানুষের নিকট অভিযোগ করে না, কারণ সে তার সকল

অভাব ও চাহিদা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে। সাহায্যকারী হিসেবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। সে কোনো স্থানে নির্জনতা অনুভব করে না এবং কাউকে ভয়ও করে না। কারণ সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। তিনিই তার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহ তাকে যে আদেশ করেছেন তা সে পরিত্যাগ করে না এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো গুনাহের কাজও করে না। কারণ সে আল্লাহকে ভীষণ লজ্জা পায়। তিনি যখন তাকে আদেশ করেছেন তখন সে তা নষ্ট করবে অথবা তিনি যখন তাকে নিষেধ করেছেন তখন সে তা করবে,

এটাকে সে অপছন্দ করে। সে কোন সৃষ্টি জীবের প্রতি যুলুম বা বাড়াবাড়ি করে না। অথবা সে কারো হক্বও ছিনিয়ে নেয় না, কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার সবকিছু অবগত আছেন। পাক-পবিত্র আল্লাহ তা‘আলা অচিরেই তার হিসাব নিবেন। সে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না, কারণ সে জানে, এর মধ্যে যা কিছু মঙ্গলময় বস্তু রয়েছে তার সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি সেগুলোকে তাঁর সৃষ্টজীব মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে তারা তাদের প্রয়োজন মাফিক তা হতে গ্রহণ করে। আর এগুলোকে তার জন্য

সহজ করে দেয়ার কারণে সে আপন রবের শুকরিয়া আদায় করে।

***

এ কিতাবে আপনার সামনে এতক্ষণ যা উপস্থাপন করা হলো তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামের মহান রোকন বা স্তম্ভ। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি এ সমস্ত রোকনের ওপর ঈমান রাখে এবং তা পালন করে তবে সে মুসলিম হয়ে যাবে। তা না করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় ইসলাম হচ্ছে দীন-দুনিয়া, ইবাদাত ও জীবনের পথ বা পন্থা। আর তা আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক জীবনব্যবস্থা যা পরিপূর্ণ ও ব্যাপক। যার বিধানের মধ্যে সার্বিক

জীবনরে সকল ক্ষত্রে, সমানভাবে ব্যক্তি ও সমাজরে প্রত্যকেরে যা প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে। চাই তা আকীদাহ-বশ্বিাসগত, রাজনতৈকি, অর্থনতৈকি, সামাজকি ও নরিাপত্তা সংক্রান্ত ইত্যাদি যকোনো বষিয়কই হোক না কনে। মানুষ এর মধ্য এমন অনকে নয়িম-নীতি ও হুকুম-আহকাম পাবে যা নরিাপত্তা, যুদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় অধকিারসমূহকে সুশৃঙ্খল কর। মানুষরে সম্মান, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এবং তার চার পাশরে পরবিশেকে সংরক্ষণ কর। তার নকিট মানুষ, জীবন, মৃত্যু এবং মরণরে পর পুনরুত্থানরে হাকীকত বা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয় পড়ছে।

এর মধ্যে সে আরও পাবে: তার চার পাশে যেসব মানুষ রয়েছে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا﴾ [البقرة: ٨٣]

“আর তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ﴾ [ال عمران: ١٣٤]

“আর যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ ٨﴾ [المائدة: ٨]

“কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে না, তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮]

দীনের স্তরসমূহ ও তার প্রতিটি স্তরের রোকনসমূহের আলোচনার পর এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে দীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ বা গুণাবলি আলোচনা করা ভালো মনে করছি।

দীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলি*[১০৬]

ইসলামের গুণাবলিকে (লিখে) পরিবেষ্টন করতে কলম অপারগ হয়ে যায় এবং এই দীনের শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি বর্ণনা করতে শব্দ গুচ্ছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কারণ আর কিছু নয়; বরং এর প্রকৃত কারণ হলো: এই দীন হচ্ছে আল্লাহর (একমাত্র মনোনীত) দীন। অতএব, চক্ষু যেমন আল্লাহকে উপলব্ধি করার দিক দিয়ে আয়ত্ত করতে পারবে না, তেমনি মানুষও জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতও, যার গুণাবলি বর্ণনা করে, কলম তাকে

বেষ্টন করতে পারবে না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আপনি যদি এই মজবুত ও নির্ভেজাল দীন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আতের ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করেন, বর্ণনা করার জন্য যার শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, যার সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য গুণ নাগাল পায় না। জ্ঞানীদের জ্ঞান যার উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যদিও তা একত্রিত হয় এবং তা তাদের সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষটির মধ্যে হয়। বরং উত্তম ও পূর্ণ জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যেকে ইসলামের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রত্যক্ষ করবে। সে

অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, জগতে এর চেয়ে পরিপূর্ণ, সুমহান ও মহত্তর শরী'আতের (দীনের) আগমন ঘটেনি।

রাসূল যদি এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নাও নিয়ে আসতেন, তবে অবশ্যই এর জন্য প্রমাণ, নিদর্শন ও সাক্ষী হিসেবে এটাই যথেষ্ট হত যে, নিশ্চয় এ শরী'আত আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। আর এ শরী'আত পুরোপুরিই এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাতে আছে পরিপূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ হিকমত, প্রশস্ত রহমত ও দয়া, তা বেষ্টন করে আছে অনুপস্থিতি ও উপস্থিতি সবকিছু, তাতে রয়েছে আদি ও অন্তের জ্ঞান। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে

যেসব বড় বড় নি'আমত দান করেছেন তার মধ্যে এটি অন্যতম। তিনি তাদেরকে যে সব নি'আমত দান করেছেন তাতে এর চেয়ে বড় নি'আমত আর কিছু দেননি যে, তিনি তাদেরকে এ শরী'আতের দিশা দিয়েছেন, এর অনুসারী করেছেন এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঐ লোকদের সাথে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি এ দীন ও শরী'আতের প্রতি হিদায়াত করাকে তাঁর বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا
مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ

ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্বীয় মহান নেয়া‘মতের কথা পরিচিতি প্রদান করে, স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং তাদেরকে এর

অনুসারী করায়, তাঁর শুকরিয়া আদায় করার আহ্বান করে বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ [المائدة: ٣]

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩][১০৭]

এই দীনের যে আদর্শ ও গুণাবলির জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত তার কতিপয় আলোচনা করা হলো:

(১) এটি আল্লাহর দীন:

এটি এমন দীন, যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। এর দিকে আহ্বানের জন্য তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন

এবং মানবকে তিনি এর গণ্ডির মধ্যে থেকেই তাঁর ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে যেমন সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য নেই, তেমনিভাবে তাঁর দীন “ইসলামের” সাথে মানুষের আইন-কানুন ও তাদের রচিত দীনের সাদৃশ্য নেই। মহান আল্লাহ যেমন সাধারণ পূর্ণাঙ্গতায় গুণান্বিত হয়েছেন, তেমনিভাবে শরী‘আতকে পূরণ করার ক্ষেত্রে যা মানুষের জীবনকাল ও পরকালের জন্য উপযোগী এবং মহান স্রষ্টার অধিকারসমূহ ও তাঁর প্রতি বান্দার কর্তব্যসমূহ, বান্দার কতকের ওপর কতকের অধিকারসমূহ ও কতকের জন্য কতকের কর্তব্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর দীন

ইসলামেরও সবধরণের পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে।

(২) সকল বিষয়ের সমাহার বা ব্যাপকতা:

এই দীনের উল্লেখযোগ্য গুণাবলির একটি হচ্ছে- প্রত্যেক বিষয়ের সমাহার ও তার ব্যাপকতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ٣٨ ﴾ [الانعام: ٣٨]

"কিতাবে আমরা কোনো বস্তুর কোনো বিষয়ই (লিপিবিদ্ধ করতে) বাদ দেয়নি।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৩৮]

অতএব এই দীন স্রষ্টার সাথে যা সম্পৃক্ত এমন প্রত্যেক বিষয় যেমন: আল্লাহ তা‘আলার নাম, তাঁর গুণাবলি ও তাঁর অধিকারসমূহ এবং সৃষ্টজীবের সাথে যা সংশ্লিষ্ট এমন প্রত্যেক বিষয়, যেমন: আইন-কানুন, দায়িত্ব, আখলাক বা নৈতিকতা, লেনদেন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই দীন পূর্ব ও পরের সমস্ত মানুষ, ফিরিশতামণ্ডলী এবং নবী ও রাসূলগণের সংবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। তেমনি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, নক্ষত্ররাজি, সাগর-মহাসাগর, গাছ-পালা, ও নিখিল বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা আছে। সৃষ্টির কারণ, লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তার সমাপ্তি, জান্নাত ও

মুমিনদের ফলাফল। জাহান্নাম ও কাফিরদের শেষ পরিণতি সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে।

(৩) সৃষ্টি জীবের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক স্থাপন করে:

প্রত্যেক বাতিল দীন ও সম্প্রদায় মানুষকে মৃত্যু, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে তার মত মানুষের সাথে জুড়ে দেয়। বরং কখনও কখনও তাকে এমন মানুষের সাথে জুড়ে দেয়, যে কয়েক শত বছর পূর্বে মরে গিয়ে হাড্ডিসার হয়েছে। পক্ষান্তরে এই দীন তথা “ইসলাম” মানুষকে সরাসরি তার রবের সাথে জুড়ে দেয়। ফলে তাদের মাঝে কোনো পুরোহিত, সাধক এবং

পবিত্র গোপন বলতে কিছু নেই। বরং তা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টজীবের মাঝে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে দেয়; এমন সংযোগ যা অন্তরকে তার রবের সাথে সম্পৃক্ত করে। যার ফলে সে (হিদায়াতের) আলো পায়, (হক) পথের সন্ধান চায়, মর্যাদাবান ও বড় হয়, পূর্ণাঙ্গতা সন্ধান করে এবং নীচ ও নগণ্য হতে নিজিকে উঁচু মনে করে। সুতরাং প্রত্যেকে অন্তর, যে তার রবের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি সে চতুষ্পদ জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক বিপথগামী।

আর এটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এমন এক সংযোগ, যার মাধ্যমে তার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যে

কী তা জানতে পারে। ফলে সে জেনে বুঝে তাঁর ইবাদাত করে। তাঁর সন্তুষ্টির স্থান ও কারণসমূহ জানতে পারে, ফলে সে তা চায়। আর তাঁর অসন্তোষের স্থানসমূহও জানতে পারে, ফলে সে তা বর্জন করে।

এটি মহান সৃষ্টিকর্তা এবং দুর্বল ও অভাবী সৃষ্টির মাঝে সংযোগ স্থাপন। ফলে সে তাঁর নিকট সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফীক কামনা করে এবং সে আরও চায় যে, তিনি যেন তাকে চক্রান্তকারীর চক্রান্ত হতে ও শয়তানের খেল তামাশা হতে হিফাযত করেন।

(৪) দুনয়িা ও আখরোতরে কল্যাণরে প্রত‍ি মন‍োয‍োগ:

ইসলামী শরী‘আত দুনয়িা ও আখরোতরে কল্যাণরে প্রত‍ি গুরুত্বার‍োপ এবং চারত্রিকি উত্তম গুণাবল‍ি পূর্ণ করার জন্য প্রতষ্ঠিতি হয়ছে।

আখরিাতরে কল্যাণরে বর্ণনা: এই শরী‘আত তার বভিন্নি দকি বর্ণনা করছে। ক‍োন‍ো কছিুই উপক্ষো করনে।ি বরং তার ক‍োন‍ো কছিুই যনে অজ্ঞাত না থাক,ে এজন্য তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বশ্লিষেণ করছে। ফল‍ে (পুণ্যবানগণক‍ে) তার নআি‘মতরে প্রতশ্রিুত‍ি দয়িছে। আর

(গুনাহগারদেরকে) তার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছে।

পার্থিব কল্যাণের বর্ণনা: আল্লাহ তা‘আলা এই দীনে মানুষের নিজ ধর্ম, জীবন, সম্পদ, বংশ, সম্মান ও জ্ঞানের সংরক্ষণের সঠিক বিধান করে দিয়েছেন।

চারিত্রিক উত্তম গুণাবলির বর্ণনা, যেমন: প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা এর নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এর যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও নিকৃষ্টতা থেকে নিষেধ করেছেন। বাহ্যিক উত্তম গুণাবলি যেমন: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত

থাকা, সুগন্ধি ব্যবহার এবং সর্বদা সুন্দর ও সজ্জিত থাকা ইত্যাদি। খারাপ কর্মসমূহকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন যেমন: যেনা-ব্যভিচার, মদপান, মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশত ভক্ষণ ইত্যাদি। পবিত্র বস্তুসমূহকে তিনি খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপচয় ও অপব্যয় করাকে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে: নিন্দিত আখলাক বা আচরণ ছেড়ে দেয়া এবং প্রশংসনীয় ও সুন্দর স্বভাবে সজ্জিত হওয়া। নিন্দিত আখলাক বা আচরণ, যেমন: মিথ্যা, পাপাচার, রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, দুনিয়া ও সুখ্যাতি

অর্জনরে লোভ, অহংকার, বড়াই, রয়িা বা কপটতা।

আর প্রশংসতি আখলাকরে মধ্যে যমেন: উত্তম চরত্রি, মানুষরে সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদরে প্রতি ইহসান করা। ন্যায়পরায়ণতা, বনিয়-নম্রতা, সত্যবাদতিা, উদার মন, ত্যাগ, আল্লাহর ওপর ভরসা, ইখলাস বা আন্তরকিতা, আল্লাহ ভীত, ধর্যৈ, শুকর ইত্যাদ।[১০৮]

(৫) সহজসাধ্য:

এই দীন যসেব গুণাবলতিে বশৈষ্ট্যিপূর্ণ হয়ছে তার মধ্যে একটি হলো সহজ ও সরলতা। অতএব, দীনরে

প্রতিটি পর্ব এবং প্রতিটি ইবাদাতেরই সহজ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ﴾ [الحج: ٧٨]

“আর তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮]

আর এই সহজসাধ্যের সর্বপ্রথম তো এই যে, যদি কেউ এই দীনে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তার কোনো মানুষের মধ্যস্থতা গ্রহণ অথবা পূর্ববর্তী কোনো স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। বরং তার যা দরকার

তা হচ্ছে: সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবে এবং বলবে:

أشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই আর মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল বা দূত।” এই দুই সাক্ষ্যের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় ঈমান আনয়ন করবে এবং তার দাবী ও চাহিদা মোতাবেক আমল করবে। অতএব যখন মানুষ সফর করে অথবা অসুস্থ হয়, তখন প্রত্যেকটি ইবাদাতের মধ্যেই সহজসাধ্যতা ও শিথিলতা প্রবেশ করে। ফলে সে গৃহে অবস্থানরত ও সুস্থ অবস্থায় যেমন

আমল করত অনুরূপ আমলই তার (আমলনামায়) লখো হয়। বরং মুসলমিরে জীবন কাফরিরে তুলনায় সহজ ও শান্তমিয়। আর কাফরিরে জীবন হয় দুঃখ-কষ্ট ও কঠনি। তমেনই মুমনিরে মৃত্যুও হয় অতি সহজভাবে, ফলে তার আত্মা (এত আরামে) বরে হয়, যমেন পাত্র থকেে (অতি সহজে ও আরামে) পানরি ফোটা বরে হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলনে,

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢ ﴾ [النحل: ٣٢]

“ফরিশিতাগণ যাদরে মৃত্যু ঘটায় পবত্রি থাকা অবস্থায়; তখন তারা বলে,

তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩২]

পক্ষান্তরে কাফিরের মৃত্যুর সময় তার নিকট কঠোর ও খুব শক্তিশালী ফিরিশতাগণ উপস্থিত হয় এবং তাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করতে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ ٩٣ ﴾ [الانعام: ٩٣]

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ সময়ের অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা

মৃত্যুযন্ত্রণার সম্মুখীন হবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে: তোমাদের প্রাণগুলো বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে অহংকার প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ٥٠﴾ [الانفال: ٥٠]

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন

ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে আর বলে: তোমরা জাহান্নামের দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫০]

(৬) ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা:

নিশ্চয় যিনি ইসলামী শরী‘আতের প্রবর্তন করেছেন তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সাদা-কালো, নারী-পুরুষ সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর হুকুম-আহকাম, ন্যায়বিচার ও রহমতের ক্ষেত্রে সবাই সমান। তিনিই নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের জন্য তেমনই শরী‘আত করেছেন যা তাদের জন্য

উপযোগী। এমতাবস্থায় শরী‘আত নারীর তুলনায় পুরুষকে সুবিধা দিবে অথবা নারীকে প্রাধান্য দিবে আর পুরুষের প্রতি যুলুম করবে অথবা সাদা বর্ণের মানুষকে কোনো বিশেষ গুণে বিশিষ্ট করবে আর কালো বর্ণের মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করবে এটা অসম্ভব। বরং সবাই আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সমান। একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ছাড়া তাদের মাঝে আর কোনো পার্থক্য নেই।

(৭) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ:

এই শরী‘আত একটি মহৎ ও সম্ভ্রান্ত গুণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা হলো

সৎ কাজরে আদশে ও অসৎ কাজ থকেে নষিধে। ফলে প্রত্যকে ক্ষমতাবান, জ্ঞানী, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমি নর ও নারীর ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজরে আদশে ও অসৎ কাজ থকেে নষিধে করা ওয়াজবি। এটা করবে আদশে ও নষিধেরে স্তর হসিবেে যমেন- সে আদশে ও নষিধে করবে তার হাত দ্বারা। কন্িতু যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে মুখ বা যবান দ্বারা করব।ে কন্িতু তাও যদি করতে সক্ষম না হয়, তবে সে তার অন্তর দ্বারা করব।ে আর এরই মাধ্যমে সম্পূর্ণ (মুসলমি) জাতি স্বীয় জাতরি তত্ত্বাবধায়ক হয়ে পড়ব।ে সুতরাং যারাই মঙ্গলজনক কাজে অবহলো করে অথবা নকিৃষ্ট কাজ করে

তাদের প্রত্যেককে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা প্রতিটি ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। চাই সে শাসক হোক অথবা শাসিত হোক, তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং ঐ শার‘য়ী নিয়ম-নীতি মোতাবেক হবে, যা এই (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের) বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।

এই বিষয়টি যেমন আপনি লক্ষ্য করছেন! (অর্থাৎ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) প্রত্যেকে ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াজিব। যে সময়ে সমসাময়িক অনেকে রাজনীতির লোকেরা গর্ববোধ করে বলে যে, তারা তাদের বিরোধী

দলগুলোকে সরকারী কাজ-কর্মের প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার এবং সরকারী আসবাবপত্র ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। (অথচ এটা তো ইসলাম পূর্বে দিয়ে দিয়েছে।)

এগুলো দীনের সামান্য কতিপয় সৌন্দর্য। আপনি যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে এর প্রতিটি পর্বে, প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে যেসব পরিপূর্ণ হিকমত, মজবুত বিধান, পূর্ণ সৌন্দর্য এবং এমন পূর্ণাঙ্গতা যা উদাহরণহীন বিষয় রয়েছে তা বর্ণনা করার জন্য ভাবা প্রয়োজন। আর যে ব্যক্তি এই দীনের (ধর্মের)

বিধানাবলিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা করবে, সে সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তা এমন চির সত্য, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই এবং এমন হিদায়াত সম্বলিত (পথপ্রদর্শন) যার মধ্যে কোনো প্রকার ভ্রষ্টতা নেই।

সুতরাং আপনি যদি আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে, তাঁর শরী‘আতকে মেনে চলতে এবং তাঁর নবী-রাসূল বা পয়গাম্বরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান, তাহলে এখনও আপনার সামনে তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। আর আপনার মহান রব, যিনি ক্ষমাশীল

ও পরম দয়ালু, তিনি আপনার যাবতীয় পাপরাশীকে ক্ষমা করে দেয়োর জন্য আপনাকে আহ্বান করছেন।

তাওবা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

“প্রত্যকে আদম সন্তানই ভুলকারী আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো তাওবাকারী।”[১০৯]

মানুষ তার মনরে দকি দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল, তমেনিভাবে সে তার দৃঢ় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তরে ক্ষত্রেও খুব দুর্বল। তাই

সে তার ত্রুটি ও গুনাহের দায়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না। ফলে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রতি সদয় হয়ে হালকা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য তাওবার বিধান চালু করেছেন। সত্যিকার তাওবা হচ্ছে, গুনাহের কারণে আল্লাহর ভয়ে এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে নি‘আমতসমূহের যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তার আশায় পাপ পরিত্যাগ করা। পূর্বে তার দ্বারা যেসব পাপ হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কৃত পাপ পুনরায় না করার ওপর দৃঢ় সংকল্প করা। জীবনের বাকী সময় সৎ আমলের দ্বারা পূরণ করা।[১১০]

লক্ষ্য করুন যে, এগুলো হলো আন্তরিক কাজ, যা তার ও তার রবের মাঝে হয়ে থাকে। যাতে কোনো পরিশ্রম, কষ্ট ও কঠিন কাজের যন্ত্রণাও নেই। বরং তা হচ্ছে অন্তরের কাজ; পাপ পরিত্যাগ করা এবং পুনরায় তা না করা। আর নিবারণের মাঝেই রয়েছে ত্যাগ ও শান্তি।[১১১]

সুতরাং কোনো মানুষের হাত ধরে তাওবা করার প্রয়োজন নেই, যে আপনার সম্ভ্রম নষ্ট করবে, আপনার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে দিবে এবং আপনার দুর্বলতাকে ব্যবহার করবে। বরং তা আপনার ও আপনার রবের মাঝে নিভৃত গোপন কথা। তাঁর কাছে ক্ষমা

প্রার্থনা করুন ও হিদায়াত চান। তিনি আপনার তাওবা কবুল করবেন।

ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো গুনাহ নেই এবং নিষ্কৃতি বা উদ্ধারকারী প্রতীক্ষিত কোনো মানুষও নেই। বরং যেমন তা অস্ট্রীয় নাগরিক মুহাম্মাদ আসাদ নামক এক ইয়াহূদী, যিনি পরবর্তীতে ইসলামের হিদায়াত প্রাপ্ত হন, তিনি তার গবেষণাকালে খুঁজে পান। তিনি বলেন, আমি কুরআনের মধ্যে যেকোনো স্থানে যা-ই বর্ণিত হয়েছে সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন খুঁজে পেতে সক্ষম হইনি (অর্থাৎ এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই তা খুঁজে

পাইনি, বরং প্রয়োজন রয়েছে এটাই বুঝেছি) আর ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথম কোনো গুনাহ নেই; যা কোনো ব্যক্তি ও তার পরিণামের মাঝে অবস্থান করে তাকে সমস্যায় ফেলে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم : ٣٩]

“আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৯]

আর (ইসলামে) মানুষের কাছে দাবী করা হয় না যে, সে কিছু উৎসর্গ পেশ করুক অথবা নিজে নিজেকে হত্যা করুক, যাতে করে তার জন্য তওবার দরজা খোলা

হয় এবং গুনাহ থেকে মুক্তি পায়।[১১২]
বরং যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨ ﴾ [النجم : ٣٨]

“অবশ্যই কোনো পাপী অন্য কারো পাপ বহন করবে না।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৮]

তাওবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা ও প্রভাব রয়েছে, এখানে কিছু উপস্থাপন করছি:

(১) বান্দা আল্লাহর ধৈর্য এবং তাঁর উদারতার প্রশস্ততা জানতে পারে যখন তিনি তার গুনাহকে গোপন রাখেন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে গুনাহের কারণে তাৎক্ষণিক তাকে

শাস্তি দিতে এবং অন্যান্য বান্দার সামনে তাকে লাঞ্ছিত করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে তার জীবনযাত্রা ভালো হতো না। বরং তিনি তাকে গোপন করার মাধ্যমে সম্মানিত করেন, তাঁর ধৈর্য দিয়ে তাকে ঢেকে দেন এবং শক্তি, সামর্থ্য ও খাদ্য-খোরাক দিয়ে তাকে সাহায্য করেন।

(২) তাওবাকারী তার আত্মার হাকীকত জানতে পারে; বস্তুত আত্মা হচ্ছে, খারাপ কাজের উস্কানি-দাতা। সুতরাং তা হতে যেসব ভুল-ভ্রান্তি, পাপ ও ব্যর্থতা প্রকাশ পায়, তা আত্মার দুর্বলতা এবং ধৈর্য ও নিষিদ্ধ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার

প্রমাণ। আর সে আত্মার বিষয়ে, সেটোকে পবিত্র করতে ও হিদায়াত দিতে, চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও, আল্লাহর অমুখাপেক্ষী নয়।

(৩) মহান আল্লাহ তাওবার বিধান প্রদান করেনে, যাতে করে এর মাধ্যমে বান্দার সৌভাগ্যরে সবচয়েে বড় উপায় অর্জতি হয়। তাওবা হলো, আল্লাহর আশ্রয় বা শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। অনুরূপ তাওবার মাধ্যমে বভিন্নি প্রকার ইবাদাত যমেন- দো‘আ, বনিয়, মনিতি, অভাব, ভালোবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদি অর্জতি হয়। ফলে আত্মা তাঁর স্রষ্টার একান্ত নকিটবর্তী হয়ে যায়। যা তাওবা ও

আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু দ্বারা অর্জিত হয় না।

(৪) আল্লাহ তা‘আলা (তাওবার দ্বারা) তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ [الانفال: ٣٨]

“যারা কুফুরী করে তাদেরকে বলুন, ‘যদি তারা বিরত হয় তবে যা আগে হয়ে গেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮]

(৫) মানুষের পাপগুলো তাওবার দ্বারা আল্লাহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ ﴾ [الفرقان: ٧٠]

“তবে যারা তাওবা করে ও ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ আমল করে; আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৭০]

(৬) মানুষ তার সগোত্রীয়দের সাথে তাদের খারাপ আচরণ ও তাকে অপমান করার ক্ষেত্রে এমন আচরণ করা উচিত, যেমন আচরণ সে আল্লাহর কাছ থেকে আশা করে, যখন সে নিজে আল্লাহর সাথে খারাপ আচরণ করে,

তাকে অমান্য করে ও তার সাথে পাপ করে। কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল। সুতরাং মানুষ যখন অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে, তখন সে আল্লাহর পক্ষ হতে অনুরূপ সদ্ব্যবহার পাবে। মহান আল্লাহ নিজ ইহসান দ্বারা তার খারাপ আচরণ ও পাপকে বদলিয়ে দিবেন, যেমন সে তার সাথে মানুষের খারাপ আচরণকে বদলিয়ে দেয়।

(৭) তাওবার কারণে সে জানবে যে, তার অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে। ফলে এটা তাকে অন্য মানুষের দোষ-ত্রুটি ধরা হতে বিরত থাকতে বাধ্য করবে। আর অন্যদের দোষ-

ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হতে নিজেকে সংশোধন করার ব্যাপারে সে ব্যস্ত থাকবে।[১১৩]

পরিশেষে এই পর্বটি শেষ করব এমন এক ব্যক্তির খবরের মাধ্যমে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে আরয করেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَكْتُ حَاجَةً وَلا دَاجَةً إِلا قَدْ أَتَيْتُ قَالَ أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثَلاث مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِك يَأْتِي على ذَلِك، وفي رواية: فَإِنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وفي رواية: فَإِنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.

“হে আল্লাহর রাসূল! ছোট-বড় এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমি করিনি

(আমি সকল প্রকার পাপের কাজ করেছি)। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিবে না যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি তিন বার বললেন। লোকটি বললেন: জী, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সাক্ষ্য প্রদান ঐ পাপকে মিটিয়ে দিবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে: নিশ্চয় এই সাক্ষ্য প্রদান ঐ সমস্ত সকল পাপকে মিটিয়ে দিবে।”[১১৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল:

أَرَأَيْتَ رَجُلًا عَمِلَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا فَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتْرُكُ حَاجَةً أَوْ دَاجَةً إِلَّا اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ، فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ أَسْلَمْتَ؟» قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «نَعَمْ، تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ وَتَتْرُكُ الشَّرَّاتِ فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْخَيْرَاتِ كُلِّهِنَّ» قَالَ وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى

“হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কী, যে সকল প্রকার পাপ করেছে, কিন্তু আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শরিক স্থাপন

করেনি? ছোট বড় এমন কোন পাপের কাজই বাদ রাখেনি বরং সে তার নিজ হস্তে সব সম্পাদন করেছে, এমতাবস্থায় তার কি তাওবার ব্যবস্থা আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তখন সে বলল: আমি এই মুহূর্তেই সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, [অর্থাৎ তোমার তাওবা আছে] (এখন থেকে) তুমি মঙ্গলজনক কাজ করবে আর মন্দ ও পাপকাজ পরিহার করবে,

তাহলে আল্লাহ তা‘আলা ঐ সমস্ত সকল মন্দ কাজগুলোকে মঙ্গলময় কাজে পরিণত করে দিবেন। সে বলল: আমার সকল প্রতারণা ও সকল পাপই কি পরিবর্তন হয়ে যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হ্যাঁ, সকল পাপই পরিবর্তন হবে। সে তখন বলল: আল্লাহু আকবার। অতঃপর সে তাকবীর ধ্বনি বলতে বলতে লোক চক্ষুর আড়াল হয়ে যায়।”[১১৫]

সুতরাং ইসলাম ইতোপূর্বের সকল পাপকে মিটিয়ে ফেলে। আর খাঁটি তাওবাও তার পূর্বেকার সকল অপরাধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস প্রমাণিত রয়েছে।

ইসলাম না গ্রহণ করার পরিণতি

ইতোপূর্বে যেমন এ কিতাবে আপনার নিকট এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর দীন। আর তা সত্য এবং এমন দীন যা নিয়ে সমস্ত নবী ও রাসূলগণ আগমন করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তিনি তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যে তাঁর কুফুরী করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

আর যেহেতু আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অধিপতি ও কর্তৃত্বকারী, আর আপনি মানুষ হলেন তাঁর একটি সৃষ্টজীব। তাই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বজগতের সবকিছুকে আপনার অনুগত করেন, আপনার জন্য তাঁর বিধান রচনা করেন ও আপনাকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। সুতরাং আপনি যদি তাঁর ওপর বিশ্বাস আনেন এবং তিনি আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা পালন করেন, আর তিনি আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করেন, তাহলে আল্লাহ আপনার সাথে আখেরাত দিবসে যে স্থায়ী নি'আমতের ওয়াদা করেছেন তা লাভ করবেন। দুনিয়াতে যেসব বিভিন্ন

প্রকার নি'আমত আপনাকে দান করেছেন তা অর্জন করবেন। আর জ্ঞানের দিক দিয়ে যার সৃষ্টি পরিপূর্ণ এবং যাদের অন্তর অধিক পবিত্র যেমন- নবী, রাসূল, নেককার, ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতামণ্ডলী, আপনি তাদের মত হলেন।

আর যদি আপনার প্রভুর কুফুরী করেন ও অবাধ্য হন, তাহলে তো আপনি আপনার দুনিয়া ও আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আপনি তাঁর ঘৃণা ও ‘আযাবকে গ্রহণ করলেন। আর আপনি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং যাদের জ্ঞান সবচেয়ে কম ও যাদের অন্তর

সবচেয়ে নিম্নতর যেমন- শয়তান, অত্যাচারী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও তাগুত, তাদের মত হলেনো। এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র। নিম্নে বিস্তারিতভাবে কুফুরীর কিছু পরিণাম উপস্থাপন করলাম যথা:

(১) ভয়-ভীতি ও অশান্তি

যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করে, তাদেরকে তিনি পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিনে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী। যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাদের স্বীয় বিশ্বাসকে যুলুমের সাথে (শির্কের সাথে) সংমিশ্রিত করেনি, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২]

আর আল্লাহ হলেন নিরাপত্তা দানকারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশ্বজগতে যা রয়েছে তার সবকিছুর অধিপতি। সুতরাং তিনি যদি কোনো বান্দাকে তাঁর ওপর ঈমান আনয়নের কারণে ভালোবাসেন, তাহলে তিনি তাকে

নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও স্থিরতা প্রদান করেন। আর মানুষ যদি তাঁর সাথে কুফুরী করে, তাহলে তিনি তার নিরাপত্তা ও শান্তি ছিনিয়ে নেন। সুতরাং আপনি তাকে দেখবেন, সে আখেরাত দিবসে তার পরিণাম সম্পর্কে সর্বদা ভীত অবস্থায় আছে। আর সে তার নিজের ওপর বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি এবং দুনিয়াতে তার ভবিষ্যতের ব্যাপারেও ভীত। আর এই নিরাপত্তা-হীনতা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা না থাকার কারণেই গোটা বিশ্বে জান ও মালের ওপর বীমা তথা ইনস্যুরেন্সের মার্কেট গড়ে উঠেছে।

(২) সংকীর্ণ জীবন:

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীর সবকিছুকে তার অনুগত করে দেন। আর তিনি প্রত্যেকটি মাখলুককে তার অংশ তথা রিযিক ও বয়স বণ্টন করে দেন। তাই তো আপনি দেখতে পান, পাখি তার রিযিকের খোঁজে সকাল বেলা বাসা হতে বেরিয়ে যায় এবং রুযী আহরণ করে। এডালে ওডালে ছুটাছুটি করে এবং মিষ্টি সুরে গান গায়। আর মানুষও এক সৃষ্টজীব যাদের রিযিক ও বয়স বণ্টন করা হয়েছে। সুতরাং সে যদি তার প্রভুর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর শরী‘আতের ওপর অটল থাকে, তাহলে তিনি তাকে সুখ ও প্রশান্তি দান করবেন এবং তার

যাবতীয় কাজকে সহজ করে দেবেন। যদিও তা জীবন গড়ার সামান্য কিছু হোক না কেন। পক্ষান্তরে সে যদি তার প্রভুর সাথে কুফুরী করে এবং তাঁর ইবাদাত করা হতে অহংকার প্রদর্শন করে, তাহলে তিনি তার জীবনকে কঠিন ও সংকীর্ণ করে দেবেন এবং তার ওপর চিন্তা ও বিষণ্ণতা একত্রে জড়িয়ে দেবেন। যদিও সে আরাম আয়েশের সকল উপকরণ এবং ভোগ সামগ্রীর বিভিন্ন প্রকার জিনিসের মালিক হয় না কেন। আপনি কি ঐ সমস্ত দেশে আত্মহত্যাকারীর আধিক্য লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের জনগণের বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের দায়িত্ব নিয়েছে এবং তাদের পার্থিব জীবনের

দ্বারা আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনি কি বিভিন্ন ধরনের অভিজাত আসবাবপত্র ও চিত্ত বিনোদনের ভ্রমণের ক্ষেত্রে অপচয় লক্ষ্য করেননি? আর এ ব্যাপারে অপচয়ের দিকে যে জিনিসটি ধাবিত করে তা হলো- ঈমান বা বিশ্বাসশূন্য অন্তর, সঙ্কীর্ণতা অনুভব এবং এসব সংকীর্ণতাকে পরিবর্তনকারী ও নতুন কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে এই মনঃকষ্টকে দূর করার প্রচেষ্টা করা। আর আল্লাহ তা‘আলা তো সত্যই বলেছেন, তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৪]

(৩) যে কুফুরী করে, সে তার আত্মা এবং সৃষ্টি জগতের যা তার চতুঃপার্শ্বে তার সাথে সংঘাতের মধ্যে জীবনযাপন করে:

এর কারণ হচ্ছে, তার আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাওহীদ তথা একত্ববাদের ওপর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾ [الروم: ٣٠]

“আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০] আর তার শরীর তার রবের জন্য আত্মসমর্পণ করে এবং তার নিয়মে চলে। কিন্তু কাফির তার সৃষ্টি তথা প্রকৃতির বিরোধিতা করে এবং সে তার স্বেচ্ছামুলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তার প্রভুর আদেশের বিপক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে। ফলে তার শরীর আত্মসমর্পণকারী হলেও তার পছন্দ হয় বিপক্ষ।

সে তার চারপাশের সৃষ্টিজগতের সাথে সংঘাতের মধ্যে থাকে। কারণ এই বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় থেকে

আরম্ভ করে সবচেয়ে ছোট কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত সবকিছু ঐ নীতি নির্ধারণের ওপর চলে, যা তাদের রব তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡأَرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]

“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্র বিশেষ। তারপর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন: তোমরা উভয়ে এসো (আমার বশ্যতা স্বীকার কর) ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল: আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।” [সূরা ফুসসিলাত,

আয়াত: ১১] বরং এই বিশ্বজগত ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করে যে আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে তার সাথে মিলে যায় এবং যে তার বিরোধিতা করে তাকে সে অপছন্দ করে। আর কাফির তো হলো এই সৃষ্টি জগতের মাঝে অবাধ্য, যেহেতু সে নিজেকে প্রকাশ্যভাবে তা প্রভুর বিরোধী হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। এজন্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য; তাকে, তার কুফুরীকে এবং তার নাস্তিকতাকে ঘৃণা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا ٨٨ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا
٨٩ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ
وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ٩٠ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ٩١

وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣﴾
[مريم: ٨٨، ٩٣]

“আর তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময় আল্লাহর ওপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে

বান্দারূপে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৮-৯৩]

মহান আল্লাহ ফির‘আউন এবং তার সৈন্যদল সম্পর্কে বলেন,

﴿فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ٢٩﴾ [الدخان: ٢٩]

“আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।” [সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ২৯]

(৪) সে মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকে:

যেহেতু কুফর বা অবিশ্বাস হলো; মূর্খতা, বরং তা সবচেয়ে বড় মূর্খতা। কারণ কাফির তার প্রভু সম্পর্কে

অজ্ঞ। সে এই বিশ্বজগৎকে দেখে; এটাকে তার প্রভু চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সে নিজেকে দেখে যা এক মহান কাজ ও গৌরবময় গঠন। তারপরও সে এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, এই বিশ্বজগতকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে তাকে গঠন করেছেন, এটা কি সবচেয়ে বড় মূর্খতা নয়?

(৫) কাফির তার নিজের প্রতি এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে তাদের প্রতি যুলুমকারী হিসেবে জীবন-যাপন করে:

কারণ সে নিজেকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। সে তার প্রভুর ইবাদাত না করে বরং অন্যের ইবাদাত করে। আর

যুলুম হচ্ছে কোন বস্তুকে তার অ-জায়গায় রাখা। আর ইবাদাতকে তার প্রকৃত হকদার ব্যতীত অন্যের দিকে ফিরানোর চেয়ে বেশি বড় যুলুম আর কী হতে পারে। লুকমান হাকীম পরিষ্কারভাবে শির্কের নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে বলেন,

﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [لقمان: ١٣]

“হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে মহা অন্যায়।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩]

সে তার চারপাশের মানুষ ও সৃষ্টিকুলের প্রতি যুলুম করে; কারণ সে প্রকৃত হকদারদের হক সম্পর্কে অবহিত হয় না। ফলে কিয়ামত দিবসে মানুষ অথবা জীব-জন্তু যাদের প্রতিই সে যুলুম করেছে, তারা সবাই তার সামনে এসে দাঁড়াবে এবং তার রবের কাছে তার নিকট থেকে তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার আবেদন করবে।

(৬) দুনিয়াতে সে নিজেকে আল্লাহর ঘৃণা ও ক্রোধের সম্মুখীন করে:

সে দ্রুত শাস্তিস্বরূপ বালা-মুসিবত ও দুর্যোগ অবতীর্ণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخۡسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ ٤٥ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ ٤٦ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٌ ٤٧﴾ [النحل: ٤٥، ٤٧]

“যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত অথবা চলাফেরা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? তারা তো এটা ব্যর্থ করতে পারবে না অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করবেন না? তোমাদের রব তো অবশ্যই

অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৫-৪৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوۡ تَحُلُّ قَرِيبٗا مِّن دَارِهِمۡ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ وَعۡدُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ٣١﴾ [الرعد: ٣١]

“যারা কুফুরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসবে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩১]

প্রশংসতি আল্লাহ তা‘আলা আরও বলনে,

﴿أَوَ أَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ﴾ [الاعراف: ٩٧]

“অথবা জনপদ বাসীরা কি এই ভয় করে না যে, আমাদরে শাস্তি তাদরে ওপর এমন সময় এসে পড়বে যখন তারা পূর্বাহ্ণে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯৮]

এমন যারাই আল্লাহর যিকির বা স্মরণকে বিমুখ করে তাদরে প্রত্যকেরে এ অবস্থা। আল্লাহ

তা‘আলা বিগত কাফির জাতির শাস্তির সংবাদ জানিয়ে বলেন,

﴿فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّنۡ أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٤٠﴾ [العنكبوت: ٤٠]

“তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম, তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি শিলাবৃষ্টি, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল বিকট শব্দ, কাউকে দাবিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ তাদের কারো প্রতি যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের

প্রতি যুলুম করেছিল।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪০]

আর আপনি যেমেন আপনার চারপাশে যাদেরে প্রতি আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরে মুসিবত লক্ষ্য করছেন।

(৭) তার জন্য ব্যর্থতা ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়:

সে তার যুলুমরে কারণে, সবচেয়ে বড় ক্ষতিতে নিপতিত হয়, তা হারানোর মাধ্যমে যার দ্বারা তার হৃদয় ও আত্মা উপকৃত হত। তা হলো- আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং তাঁকে ডাকার মাধ্যমে

তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও তাঁর প্রশান্তি লাভ।

সে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ সে দুনিয়াতে শোচনীয় ও দিশেহারা হয়ে জীবন-যাপন করে।

আর সে তার নিজের জানের ক্ষতি করে, অথচ এর জন্যই সে সম্পদ জমা করে। কারণ, তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে নিজেকে সেই কাজে নিয়োজিত করে না এবং দুনিয়াতে সে এর দ্বারা সুখীও হয় না। কারণ সে হতভাগ্য হয়ে বেঁচে থাকে, হতভাগ্য হয়ে মারা যায় এবং কিয়ামত দিবসে তাকে হতভাগাদের সাথে পুনরুত্থিত করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم﴾ [الاعراف: ٩]

“আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে ঐসব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯]

সে তার পরিবারের ক্ষতি করে, কারণ সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করা অবস্থায় তাদের সাথে বসবাস করে। সুতরাং তারাও দুঃখ ও কষ্টের ক্ষেত্রে তার সমান এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ﴾ [الزمر: ١٥]

“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৫]

আর কিয়ামত দিবসে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট জায়গা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ ٢٣﴾ [الصافات : ٢٢، ٢٣]

“(ফিরিশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদাত করতো-আল্লাহর পরিবর্তে এবং

তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের পথে।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ২২, ২৩]

(৮) সে তার রবের প্রতি অবিশ্বাসী এবং তাঁর নি‘আমতের অস্বীকারকারী রূপে জীবন-যাপন করে:

আল্লাহ তা‘আলা তাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে হতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং তার প্রতি সকল প্রকার নি‘আমত পূর্ণ করেন। অতএব সে কীভাবে অন্যের ইবাদাত করে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ...... কোন অস্বীকৃতি এর

চেয়ে বেশি বড়? কোন অস্বীকৃতি এর চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট?

(৯) সে প্রকৃত জীবন থেকে বঞ্চিত হয়:

কারণ পার্থিব জীবনের যোগ্য মানুষ তো সেই, যে তার রবের প্রতি ঈমান রাখে, তার উদ্দেশ্যকে জানতে পারে, তার গন্তব্য তার জন্য স্পষ্ট এবং সে তার পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে। অতএব, সে প্রত্যেক হকদারের হক সম্পর্কে অবহিত, কোনো হককেই সে অবজ্ঞা করে না এবং কোনো সৃষ্টজীবকে কষ্ট দেয় না। ফলে সে সুখীদের মত জীবনযাপন করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর জীবন লাভ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ﴾ [النحل: ٩٧]

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭]

আর আখেরাতে রয়েছে—

﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ [الصف: ١٢]

“স্থায়ী জান্নাতের (আদন নামক জান্নাতের) উত্তম বাসগৃহ। এটাই মহা সাফল্য।” [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ১২]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবনে চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো

জীবন-যাপন করে; অতএব সে তার রবকে চেনে না এবং সে জানে না যে তার উদ্দেশ্য কী এবং এও জানে না যে, তার গন্তব্য-স্থল কোথায়? বরং তার উদ্দেশ্য হলো; খাবে, পান করবে এবং ঘুমবে। তাহলে তার মাঝে এবং সমস্ত জীব-জানোয়ারের মাঝে কী পার্থক্য? বরং সে তাদের চাইতে বড় বেশি বিপথগামী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٧٩ ﴾ [الاعراف: ١٧٨]

“আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]

“আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারা তো

পশুর মত বরং তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৪৪]

(১০) চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে:

কারণ কাফির এক শাস্তি থেকে আরেক শাস্তিতে স্থানান্তর হয়। তাই সে দুনিয়া থেকে বের হওয়া থেকে আরম্ভ করে আখেরাত পর্যন্ত ওর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা ও বিপদ ভোগ করতে থাকে। এর প্রথম পর্যায়ে সে যে শাস্তির উপযুক্ত তা প্রদান করতে তার নিকট মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফিরিশতা আগমন করার আগেই শাস্তির

ফেরেশতা আগমন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ﴾ [الانفال: ٥٠]

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন ফেরেশতাগণ কাফিরদের রূহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫০]

তারপর যখন তার রূহ বের হয় এবং তার কবরে অবতরণ করে তখন সে এর চেয়ে বেশি কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়।

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের বংশধরের সংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]

“সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আগুনের সম্মুখে, আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফির‘আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৪৬]

তারপর যখন কিয়ামত হবে, সকল সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থিত করা হবে, মানুষের আমলসমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে, তখন কাফিররা

দেখবে; আল্লাহ তা‘আলা তাদের যাবতীয় আমলকে সেই কিতাবের মধ্যে লিখে রেখেছেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩﴾ [الكهف: ٤٩]

““আর উপস্থাপিত করা হবে ‘আমলনামা, তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই

হিসেবে করে রেখেছে।’ আর তারা যা আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে; আর আপনার রব তো কারো প্রতি যুলুম করেন না।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

সেখানে কাফির কামনা করবে যে, সে যদি মাটি হয়ে যেতো:

﴿يَوۡمَ يَنظُرُ ٱلۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا﴾ [النبا: ٤٠]

“সেদিন মানুষ তার নিজ হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফির বলতে থাকবে: হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!” [সূরা আন-নাবা, আয়াত: ৪০]

কিয়ামত দিবসের সেই অবস্থার তীব্র আতঙ্কের কারণে, মানুষ যদি পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হতো, তাহলে অবশ্যই তারা সেই দিনের ‘আযাব থেকে বাঁচার জন্য তা মুক্তিপণ দিতো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ ٤٧﴾ [الزمر: ٤٦]

“যারা যুলুম করেছে তাদের কাছে যদি সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো সম্পদ থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য

মুক্তিপণ স্বরূপ সকল কিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৭]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ يُبَصَّرُونَهُمۡۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ
يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ ١١ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي
تُـٔۡوِيهِ ١٣ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ يُنجِيهِ ١٤ ﴾
[المعارج: ١١، ١٤]

“তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে আপন সন্তানকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই

মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দিয়ে।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১১-১৪]

কারণ সেই জায়গা (নিবাস) তো হলো প্রতিদানের জায়গা, তা কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গা নয়। সুতরাং মানুষ তার কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে; দুনিয়ায় যদি তার কর্ম ভালো হয়, তবে তার প্রতিদানও ভালো হবে। আর দুনিয়ায় যদি তার কর্ম মন্দ হয়, তবে তার প্রতিদানও হবে মন্দ। আর আখিরাতের আবাসস্থলে কাফির যে মন্দ জিনিস পাবে তা হলো- জাহান্নামের শাস্তি। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করবেন, যাতে করে তারা তাদের

মন্দ কর্মের কঠিন শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٤٣ يَطُوفُونَ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَ حَمِيمٍ ءَانٖ ٤٤ ﴾ [الرحمن: ٤٣، ٤٤]

“এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।” [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৪৩, ৪৪]

আর তিনি তাদের পানীয় এবং পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ١٩ يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ

وَٱلۡجُلُودُ ٢٠ وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٖ ٢١ ﴾ [الحج : ١٧، ٢١]

“সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা, তাদের পেটে যা রয়েছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহা হাতুড়িসমূহ।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১৯-২১]

উপসংহার

হে মানুষ! আপনি তো অস্তিত্বহীন ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা

আপনাকে অস্তিত্ব দান করেছেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَوَ لَا يَذۡكُرُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ يَكُ شَيۡـٔٗا﴾ [مريم: ٦٧]

“মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমরা তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৭]

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এক ফোঁটা শুক্র-বিন্দু থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেন, তারপর আপনাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا ١ إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٢﴾ [الانسان: ١، ٢]

“মানুষের ওপর অন্তহীন মহাকালের এমন এক সময় কি আসেনি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না? আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্র বিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করবো এজন্য আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।” [সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ১-২]

ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, এরপর আবারও আপনার প্রত্যাবর্তন হয় দুর্বলতার দিকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٖ ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ ٥٤﴾ [الروم: ٥٤]

"আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দূর্বলরূপে। অতঃপর দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৪]

অতঃপর সর্ব শেষে হয় মৃত্যু, যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। আর আপনি (জীবনের) সেই স্তরগুলোর এক দুর্বলতা হতে আরেক দুর্বলতায়

স্থানান্তরিত হন, কিন্তু আপনি আপনার নিজের ক্ষতিকে দূর করার সামর্থ্য রাখেন না, আর আপনি এ ব্যাপারে আপনার প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নি'আমত যেমন শক্তি, সামর্থ্য ও খাদ্য ইত্যাদির সাহায্য চাওয়া ব্যতীত আপনি আপনার নিজের কোনো উপকার করতে পারেন না। আর আপনি তো সৃষ্টিলগ্ন হতেই অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী। আপনার জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আপনার হাতের নাগালে নয়, এমন কত জিনিসেরই না আপনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ওগুলি আপনি কখনও লাভ করেন আবার কখনও তা ছিনিয়ে নেন। এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনার উপকার করে,

সেগুলো আপনি অর্জন করতে চান, ফলে কখনও এগুলো জয় করেন, আবার কখনও অকৃতকার্য হন। এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনার ক্ষতি করে, আপনার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে, আপনার প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে এবং আপনার ওপর বিপদ-আপদ ও কষ্ট নিয়ে আসে, আর আপনি তা বিদূরিত করতে চান, ফলে কখনও একে দূর করেন, আবার কখনও অপারগ হন। আপনি কি আল্লাহর প্রতি আপনার অভাব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুভব করেন না? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥﴾ [فاطر: ١٥]

“হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৫]

ক্ষুদ্র ভাইরাসে আপনি আক্রান্ত হন, যা খালি চোখে দেখা যায় না, ফলে তা আপনাকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করে, কিন্তু আপনি তা দূর করতে সক্ষম হন না, আর তখন আপনি আপনার মত এক দুর্বল মানুষের নিকট গমন করেন এই আশা নিয়ে যে, সে আপনার চিকিৎসা করবে। সুতরাং কখনও ঔষধে কাজ করে (রোগ ভালো

হয়), আবার কখনও ডাক্তার তা ভালো করতে অপারগ হয়। তখন রোগী ও ডাক্তার উভয়ই দিশেহারা হয়ে পড়ে।

হে আদম সন্তান, দেখুন আপনি কত দুর্বল! যদি একটি মাছি আপনার কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেয় (যেমন শরীরের রক্ত), তাহলে আপনি তার থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন না। আর আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন; তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ ٧٣﴾ [الحج : ٧٣]

“হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, অতএব তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট থেকে, এটাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী এবং দেবতা কতই না দুর্বল!” [সূরা আল-হজ্জ্ব, আয়াত: ৭৩]

সুতরাং সামান্য একটি মাছি যা আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ে তা যদি আপনি উদ্ধার করতে সক্ষম না হন, তাহলে

আপনি আপনার কোন জিনিসের ক্ষমতা রাখেন? আপনার তাকদীর ও জীবন তো আল্লাহর হাতে, আর আপনার অন্তর তাঁর হাতের দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ওলট-পালট করেন। আপনার জীবন ও মৃত্যু এবং আপনার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাঁরই হাতে। আপনার নড়াচড়া ও নীরবতা এবং আপনার সমস্ত কথাবার্তা তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছাতেই হয়। সুতরাং তাঁর বিনা হুকুমে আপনি নড়েন না এবং তাঁর বিনা ইচ্ছাই কোনো কিছু করেন না। তিনি যদি আপনার ওপর আপনার নিজের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাহলে তো তিনি এক অক্ষম, দুর্বল, শিথিল, গুনাহ ও

ভুলকারীর নিকট আপনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আর যদি তিনি অন্যের নিকট আপনার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাহলে তো তিনি আপনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এমন এক ব্যক্তির নিকট, যে ব্যক্তি আপনার কোনো ক্ষতি, লাভ, মৃত্যু, জীবন এবং পুনরুত্থান করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তাঁর নিকট হতে আপনার এক পলক অমুখাপেক্ষী হওয়ার কোনোই উপায় নেই। বরং গোপনে ও প্রকাশ্যে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আপনি তাঁর নিকট নিরুপায়। যিনি আপনার ওপর সমস্ত নি'আমত পূর্ণ করেন। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দিক দিয়ে তাঁর নিকট আপনার তীব্র প্রয়োজন থাকা

সত্ত্বেও, পাপাচার ও কুফুরী করার মাধ্যমে আপনি তার কাছে নিজেকে ঘৃণিত করেন। আপনি তাঁকে ভুলে রয়েছেন, অথচ আপনাকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর সামনে আপনাকে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে।[১১৬]

হে মানুষ ! আপনার গুনাহের বোঝা বহন করার অক্ষমতা ও দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি,

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا﴾ [النساء : ٢٨]

“আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, যেহেতু মানুষ দুর্বলরূপে

সৃষ্ট হয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৮]

তাই তিনি রাসূল প্রেরণ করেন, কিতাব অবতীর্ণ করেন, বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন, আপনার সামনে সঠিক পথ দাঁড় করান এবং যুক্তি, দলীল-প্রমাণাদি ও সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি তিনি আপনার জন্য প্রতিটি বিষয়ে এমন নিদর্শন স্থির করেন যা তাঁর একত্ববাদ, প্রভুত্ব ও উপাসনার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে আপনি বাতিল দিয়ে হক বা মহা সত্যকে দূর করেন এবং আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেন ও

বাতিলের সাহায্যে বিতর্কে লিপ্ত হন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَكۡثَرَ شَيۡءٖ جَدَلٗا﴾ [الكهف: ٥٤]

“আর মানুষের অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫৪]

আর আপনাকে আল্লাহর ঐ সমস্ত নি‘আমতের কথা ভুলিয়ে দেন, যার মধ্যে আপনি আপনার শুরু এবং শেষে অতিবাহিত করেন! আপনি কি স্মরণ করেন না, আপনাকে এক ফোঁটা শুক্র-বিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তারপর আপনার প্রত্যাবর্তন হবে কবরে, অতঃপর সেখান হতে আপনার

পুনরুত্থানের পর ঠিকানা হবে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلٗا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ ٧٨ قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ ٧٩﴾ [يس: ٧٧، ٧٩]

“মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র-বিন্দু হতে? অথচ হঠাৎ করেই সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা পেশ করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে: হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে গলে

যাবে? (হে রাসূল) আপনি তাদেরকে বলুন: এতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তো তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৭৭-৭৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ٦ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨﴾ [الانفطار: ٦، ٨]

“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। যে আকৃতিতে

চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন।” [সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত: ৬-৮]

হে মানুষ! আপনি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকবেন এই আনন্দ থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন? যাতে করে তিনি আপনাকে অভাব-মুক্ত করেন, আপনাকে আরোগ্য দান করেন, আপনার বিপদ-আপদ দূর করেন, আপনাকে ক্ষমা করেন, আপনার অনিষ্টকে অপসারণ করেন, আপনার প্রতি যুলুম করা হলে সাহায্য করেন, আপনি দিশেহারা এবং পথভ্রষ্ট হলে পথ দেখান, আপনি অজ্ঞ হলে শিক্ষা দেন, ভয় পেলে

নরিাপত্তা দনে, আপনার দুর্বলতার সময় দয়া করনে, আপনার শত্রুদরেকে আপনার নকিট থকেে নবিৃত্ত করনে এবং আপনাকে রযিকি দনে।

হে মানুষ! আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে সব নি‘আমত দান করছেনে তার মধ্যে সত্য দীনরে নি‘আমতরে পর সব চাইতে বড় নি‘আমত হলো জ্ঞান বা বুদ্ধি। কারণ যা তার উপকার করে এবং যা ক্ষতি করে, সে এর মাধ্যমে পার্থক্য করে, আল্লাহর আদশে ও নষিধেকে বুঝে এবং এর মাধ্যমইে সে জানতে পারে মানুষ সৃষ্টরি মহান উদ্দশ্যেকে; আর তা হলো: একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার

ইবাদাত বন্দগেী করা, যার কোনো অংশীদার নইে। আল্লাহ পাক বলনে,

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ ٥٣ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنكُم بِرَبِّهِمۡ يُشۡرِكُونَ ٥٤﴾ [النحل: ٥٣، ٥٤]

“তোমরা যসেব নি‘আমত ভোগ কর, তা তো আল্লাহরই নকিট থকেে; আবার যখন দুঃখ-কষ্ট তোমাদরেকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকইে ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। এরপর যখন আবার আল্লাহ তোমাদরে দুঃখ-কষ্টকে দূরীভূত করনে, তখন তোমাদরে একদল তাদরে রবরে সাথে

অংশীদার স্থির করে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৩-৫৪]

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় জ্ঞানবান ব্যক্তি মহত্তর কর্মসমূহ পছন্দ করে এবং নিকৃষ্ট ও নীচু কর্মসমূহকে ঘৃণা করে, আর প্রত্যেক সম্মানিত নবী ও সৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা ভালোবাসে এবং সে তাদের নাগাল না পেলেও তার মন সব সময় তাদের সাথে মিলিত হতে চায়। আর সে পথ পাওয়ার রাস্তা তো হলো এটাই; মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে যে পথনির্দেশ করেছেন:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]

“যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসা তবে আমার অনুসরণ কর , তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

সুতরাং সে যদি এই বাণী মান্য করে চলে, তবে আল্লাহ তাকে নবী, রাসূল, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩﴾ [النساء : ٦٩]

“আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ-যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ

করছেনে- তাদরে সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৯]

হে মানুষ! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি একটি নির্জন স্থানে একাকী হন, অতঃপর চিন্তা করুন; আপনার নিকট সত্য কি এসেছে? আপনি তার দলীল দেখুন এবং তার যুক্তি ও প্রমাণাদি নিয়ে গবেষণা করুন। ফলে আপনি যদি দেখেন যে তা সত্য, তাহলে তার অনুসরণ করুন। কখনও পরিচিতি অভ্যাস ও দেশে প্রথার নিকট বন্দী হবেন না। জেনে রাখবেন! নিশ্চয় আপনার জীবন আপনার নিকট, আপনার বন্ধু-বান্ধব, জমি-জমা এবং বাপ-দাদার

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির চেয়েও অধিক সম্মানিত। আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে এর উপদেশ দেন এবং তিনি বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِيرٞ لَّكُم بَيۡنَ يَدَيۡ عَذَابٖ شَدِيدٖ ٤٦﴾ [سبا: ٤٦]

“(হে রাসূল!) আপনি বলুন: আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন অথবা এক এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি

সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।” [সূরা সাবা, আয়াত:৪৬]

হে মানুষ! আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আপনার কোনো কিছুই হারানোর নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا ٣٩﴾ [النساء : ٣٩]

“আর এতে তাদের কী হতো, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তা থেকে ব্যয় করতো? আর আল্লাহ তাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত:৩৯]

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: তারা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং ভালো পথে চলে তবে তাদেরকে কোনো জিনিস ক্ষতি করবে? বরং তারা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ঐ খাতে ব্যয় করে যা তিনি ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন; তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিয়ামত দিবসে সৎ আমলকারীদের সাথে যেমন আচরণ করবেন, তাদের সাথেও তেমনই আচরণ করবেন। আর তিনি তো তাদের সৎ ও বাতিল নিয়ত এবং তাদের মধ্যে কে আল্লাহর তাওফীক পাওয়ার হকদার সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

ফলে তিনি তাকে তাওফীক দান করেন এবং তার অন্তরকে হিদায়াতের দিকে চলতে ইলহাম (গোপন নির্দেশ প্রদান) করেন। আর তিনি তাকে এমন সৎ কাজের জন্য নিয়োজিত করেন যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। আর মহান আল্লাহর নৈকট্য থেকে কে ব্যর্থ ও বিতাড়নের হকদার তাও তিনি অবগত আছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে বিতাড়িত সে তো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিশ্চয় আপনার ইসলাম গ্রহণ করা, তা আপনার মাঝে এবং আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন এমন যে

কোনো কাজ করার মাঝে, কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। বরং আল্লাহ আপনাকে প্রত্যেক আমলের বিনিময়ে সাওয়াব দেবেন যা আপনি একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করেন। যদিও তা আপনার দুনিয়ার কাজে লাগে এবং আপনার সম্পদ, মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করে। এমনকি আপনি যে সমস্ত মুবাহ বা বৈধ কোনো কিছু গ্রহণ করেন, সে ক্ষেত্রে যদি হারাম থেকে বাঁচার জন্য হালালের ওপর তৃপ্ত থাকার সাওয়াব কামনা করেন, তাহলেও এর মধ্যে আপনার জন্য সাওয়াব আছে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»

“তোমাদের কারোও স্ত্রী সহবাসেও সদকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটা কীভাবে হয় যে, আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জন করবো আর তাতে সাওয়াবও রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা বল তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তাহলে তার কি গুনাহ হবে না? অতএব, সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে অবশ্যই সাওয়াব হবে।”[১১৭]

হে মানুষেরা! নিশ্চয় রাসূলগণ সত্য সহকারে আগমন করেন এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রচার করেন। আর মানুষ তাঁর শরী‘আতকে জানার ব্যাপারে মুখাপেক্ষী, যাতে করে সে এই পার্থিব জীবনে বুদ্ধিমত্তার সাথে চলতে এবং আখেরাতে কামিয়াব হতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقِّ مِن رَّبِّكُمۡ فَـَٔامِنُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ وَإِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧٠﴾ [النساء: ١٧٠]

“হে মানুষেরা! নিশ্চয় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্যসহ রাসূল আগমন করেন। অতএব তোমরা

ঈমান আনয়ন কর, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তবে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭০]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيۡكُم بِوَكِيلٖ ١٠٨﴾ [يونس : ١٠٨]

“(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন: হে মানুষেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য (দীন) এসেছে। অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে,

বস্তুত সে নিজের জন্যই সঠিক পথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই ওপর বর্তাবে, আর আমাকে তোমাদের ওপর দায়বদ্ধ করা হয়নি।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৮]

হে মানুষ! আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাতে আপনার নিজেরই লাভ। আর যদি আপনি কুফরি করেন তবে তাতে আপনার নিজেরই ক্ষতি। মহান আল্লাহ তো তাঁর বান্দা থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং অবাধ্যদের অবাধ্যতা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর আনুগত্যকারীর আনুগত্যও তাঁর কোনো উপকার

করতে পারে না। ফলে তাঁর অজান্তে কেউ পাপ কার্য করতে এবং তাঁর বিনা হুকুমে কেউ আনুগত্য করতে পারে না। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ দেন যে তিনি বলেন:

«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»

“হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি; আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিলাম। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং

আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি, সে ছাড়া সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে কাপড় পরিয়েছি সে ব্যতীত, তোমরা সবাই বিবস্ত্র। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত-দিন গুনাহ করছ, আর আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা

কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে; আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার সামর্থ্য রাখ না যে, আমার ভালো করবে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন্ন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তির হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন্ন যদি তোমাদের মধ্যে একজন সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ

ও জিন্ন যদি একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই, তবে আমার কাছে যা আছে তাতে সমুদ্রে একটি সুই ডুবালে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছুই কম হতে পারে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্যে গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা উচিৎ, আর যে এর বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিৎ।”[১১৮]

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের রব। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নবী ও রাসূলগণের সর্বোত্তম ব্যক্তি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সহচরবৃন্দের ওপর।

সমাপ্ত

[১]. الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য আল-কুরআন।

[২]. বিস্তারিত দেখুন: শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ‘আল আকীদাহ আস-সহীহা ওমা ইউদ্বাদ্দুহা’ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ‘আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ’।

[৩]. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘মাজমুআয়ে ফাতাওয়া’ ১ম খণ্ড; ৪৭-৪৯ এবং ৭৩ নং পৃষ্ঠা।

[৪] সহীহ বুখারী, তাকদীর অধ্যায়; পরিচ্ছেদ ৩, হাদীস নং ১৩৫৮ এবং সহীহ মুসলিম, তাকদীর অধ্যায়; হাদীস নং ২৬৫৮, হাদীসের শব্দগুলো তাঁরই।

[৫] মুসনাদ ইমাম আহমাদ; ৪র্থ খণ্ড, ১৬২ নং পৃষ্ঠা এবং সহীহ মুসলিম; জান্নাত এবং তার সুখ ও তার বাসিন্দাদের বর্ণনা অধ্যায়, হাদীস নং ২৮৬৫, হাদীসের শব্দগুলো তারই।

[৬] মাজমূ‘ ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ, ১৪ তম খণ্ড; ৩৮০-৩৮৩, এবং ৭ম খণ্ড; ৭৫ নং পৃষ্ঠা।

[৭]. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রচিত ‘কিতাবুত তাওহীদ’।

[৮]. শারহু ‘আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩৯।

[৯]. এখানে ওলী বলতে যারা মুত্তাকী, পারহেযগার বান্দা এবং শরী‘আতের যাবতীয় হুকুম আহকাম ও হালাল-হারাম মেনে চলেন তারাই উদ্দেশ্য, বর্তমান সমাজে শির্ক-বিদ‘আতের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এক শ্রেণির নামধারী কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী ও কবর পূজারী পীর-মাশায়েখ উদ্দেশ্য নয়। -অনুবাদক।

[১০]. শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত “কুররাতু ‘উয়ুনুল মুওয়াহহিদীন”, পৃ. ১০০। অর্থাৎ যার মধ্যে বড় শির্ক নেই, বড় কুফুরী নেই, বড় নিফাকী নেই। শির্ক, কুফর ও নিফাকের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ আছে, জাহান্নামে পড়ে আছে, তাহলে তার জন্য সুপারিশ করা হবে। সে হিসেবে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে সুপারিশের জন্য দু’টি শর্ত নির্ধারিত হলো:

১- অবশ্যই আল্লাহর অনুমতিতে হতে হবে। তিনি দয়াপরবশ হয়ে যার জন্য অনুমতি দিবেন তিনিই শুধু সুপারিশ করবেন।

২- যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে অবশ্যই বড় শির্ক, বড় কুফুরী এবং বড় নিফাকী থেকে মুক্ত থাকতে হবে। [সম্পাদক]

[১১] যেহেতু এখন কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না তাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একক এবং এককভাবে সমগ্র জগত পরিচালনা করেন। অন্যথায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। —অনুবাদক।

[১২] শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা।

[১৩] ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ (১/২৬০)।

[১৪] আরও দেখুন, সূরা আর-রা‘দের প্রথমদিকের আয়াতগুলো। —অনুবাদক।

[১৫] এই অংশটি ‘মিফতাহু দারুস সাআ’দাহ’ ১ম খণ্ডের ২৫১- ২৬৯ নং পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থান হতে চয়ন করা হয়েছে।

[১৬] মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ, ১ম খণ্ড; ৩২৭, ৩২৮ নং পৃষ্ঠা।

[১৭] সিফরুল জামে‘য়া, আল ইসহাহ: ৭, ২৫-২৬; আর একথা সবার জানা আছে যে, ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা একে পবিত্র মনে করে এবং তাকে বিশ্বাস করে।

[১৮] ড. আহমাদ শবিলী রচতি ‘সলিসলিাতু মুকারানাতলি আদইয়ান: ৩য় খণ্ড, ২১০-২১৩ নং পৃষ্ঠা।

[১৯] দখেুন: মফিতাহু দারসি্ সা‘আদাহ; খণ্ড ১, পৃ. ৬-১১।

[২০] দখেুন: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইময়িা রাহমিাহুল্লাহ রচতি ‘আত্তাদমুরয়ি্যাহ’ ২১৩, ২১৪ নং পৃষ্ঠা এবং ‘মফিতাহু দারসি সাআদাহ’ ২য় খণ্ড, ৩৮৩ নং পৃষ্ঠা।

[২১] বসি্তারতি দখেুন: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারায লখিতি ‘আদ-দীন’ নামক গ্রন্থ, ৮৭ নং পৃষ্ঠা।

[২২] প্রাগুক্ত, ৮৮ নং পৃষ্ঠা।

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪ ও ৯৮।

[২৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ‘আল-ফাওয়াইদ’ ১৮এবং ১৯ নং পৃষ্ঠা।

[২৫] দেখুন: আদ-দীন, পৃ. ৯৮, ১০২।

[২৬] দেখুন: এ গ্রন্থের পরবর্তী... পৃষ্ঠাসমূহ।

[২৭] দেখুন: আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ; ৪র্থ খণ্ড, ৯৭ নং পৃষ্ঠা।

[২৮] দেখুন: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত: মাজমূ‘ ফাতওয়া; ৪র্থ খণ্ড, ২১০, ২১১ নং পৃষ্ঠা।

[২৯] বিস্তারিত দেখুন: স্যামুয়েল ইবন ইয়াহইয়া আল-মাগরিবী নামক এক ইয়াহূদী যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন তার লিখিত “ইফহামুল ইয়াহুদ” গ্রন্থ।

[৩০] তালমূদ শব্দের অর্থ- ইয়াহূদীদের ধর্ম ও আদব শিক্ষার কিতাব। যা মূলত বিভিন্ন সময়ে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের দ্বারা “মাশনা” তথা শরী‘আত” কিতাবের ওপর লিখিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও টীকার সমষ্টি। [মূল ভাষ্যকে “মাশনা” আর টীকাগুলোকে ‘জামারাহ’ বলা হয়, ভাষ্য ও ব্যাখ্যা এ দুটো মিলিয়েই হলো ‘তালমূদ’]

[৩১] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: ড. রুহলাঞ্জ রচিত ‘আল-ইয়াহূদী আলা

হাসাবতি তালমূদ’ এবং ড. ইউসুফ হান্না নাসরুল্লাহ কর্তৃক ফ্রান্স থকেে আরবী ভাষায় ঐ গ্রন্থটরি অনুবাদ গ্রন্থ ‘আল-কানযুল মারসূদ ফী কাওয়াইদতি তালমূদ’।

[৩২] বসি্তারতি দখেুন: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইময়ি্যাহ রাহমিাহুল্লাহ রচতি ‘আল-জাওয়াবুস সহীহ লমিান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ’ এবং রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীল হনি্দী রচতি ‘ইযহারুল হক্ব’ ও আব্দুল্লাহ তরজুমান যনিি খ্রষি্টান ছলিনে, পরে মুসলমি হন তার লখিতি ‘তুহফাতুল আরীব ফরি-রদ্দি ‘আলা উব্বাদসি সলীব’ গ্রন্থসমূহ।

[৩৩] দেখুন: দারাবুর নামে প্রসিদ্ধ এক ইউরোপীয় লেখকের ‘আস-সেরো‘ বাইনাদ দীনি ওয়াল ইলমি ৪০ও ৪১ নং পৃষ্ঠা।

[৩৪] খ্রিষ্টানদের মতে এই তিনি ব্যক্তি হলো- পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। —অনুবাদক।

[৩৫] দায়েরোতুল মা‘আরেফি আল-কাথুলিকিয়্যিাহ নাম গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত, গবেষণাপত্রের শিরোনাম, ‘আস-সালাসুল মুকাদ্দাস, খণ্ড ১৪, পৃ. ২৯৫।

[৩৬] Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the

Light of Modern Knowledge. Glasgow, ১৯২৯ p ৪০৭.

[৩৭] দেখুন: ডনেমার্করে কোপনহগেনে বশি্ববদি্যালয়রে প্রাচ্য ভাষাবদি ও ইরানরে ইতহিাস বশিষেজ্ঞ প্রফসের আর্থার কৃষ্টান সীন রচতি “ইরান ফী আহদসি সাসানয়ি্যীন” এবং শাহীন মাকারডিস আল মাজূসী লখিতি “ইরানরে ইতহিাস” গ্রন্থদ্বয়।

[৩৮] ইরান ফী ‘আহদসি সাসানয়ি্যীন, পৃ. ১৫৫।

[৩৯] পূর্বোক্ত উৎস, বাবুদ দনি আয-যারাদাশতি, দয়িানাতুল হুকূমাহ, পৃ. ১৮৩-২৩৩।

[৪০] দেখুন: হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ‘ঈশ্বর তূবা’ এর ‘আল হিন্দুল ক্বাদীমাহ বা প্রাচীন ভারত’ এবং সাবেক ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহার লাল নেহেরু লিখিত ‘ইকতশোফুল হিন্দ, ২০১- ২০২ নং পৃষ্ঠা।

[৪১] দেখুন: আর দত্তের লিখিত ‘আল হিন্দুল ক্বাদীমাহ (বা প্রাচীন ভারত) গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, ২৭৬ নং পৃষ্ঠা এবং ও.এস.এস.আই মালের লিখিত ‘আল-হান্দাকিয়্যাতুস সায়্যিদাহ, ৬-৭ নং পৃষ্ঠা।

[৪২] বৌদ্ধস্তুপ বলতে উপসনালায়, তাদের মতে তা গৌতম বুদ্ধের দেহ, বাণী ও আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে।

[৪৩] C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone ১৯২১).

[৪৪] দেখুন: আবুল হাসান নদভীর আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ, ১৯-২৮ নং পৃষ্ঠা।

[৪৫] তাফসীর ইবন কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৬৪ নং পৃষ্ঠা

[৪৬] দেখুন, লাওয়ামি‘উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ২৬৫-৩০৫; আহমাদ শালাবী, আল-ইসলাম, পৃ. ১১৪

[৪৭] আল-মাওয়ারদী, আ‘লামুন নাবুওয়াহ, পৃ. ৩৩।

[৪৮] তিনি হচ্ছেন, আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন আব্দুস সালাম, যিনি ইবন তাইমিয়্যাহ নামে বিখ্যাত। জন্ম হিজরী ৬৬১, মৃত্যু ৭২৮ হিজরী। ইসলামের বড় আলেমগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে।

[৪৯] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত “মাজমূউল ফাতাওয়া” কিতাবের “কায়দোতুন ফী উজূবিল ই‘তিসামি বির রিসালাহ” অধ্যায়, ১৯শ খণ্ড, ৯৯-১০২ নং পৃষ্ঠা এবং আরো দেখুন-

লাওয়ামি‘উ আনওয়ারুল বাহীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, ২৬১-২৬৩ নং পৃষ্ঠা।

[৫০] ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা, ৯৬।

[৫১] দেখুন: ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ রচিত “আল ফাওয়াইদ” পৃ. ৬-৭।

[৫২] সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪; দেখুন- ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত “আল ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা: ৬, ৯ এবং ইমাম আর রাযীর “তাফসীরুল কাবীর; ২য় খণ্ড, ১১৩-১১৬ নং পৃষ্ঠা।

[৫৩] মাজাল্লাতু দ্দা’ওয়া আস-সাউদিয়্যাহ, ১৭২২ নং সংখ্যা, তারিখ: ১৯/০৯/১৪২০ হিজরী, ৩৭ নং পৃষ্ঠা।

[৫৪] এ মূলনীতিগুলোর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫, ২৮৬; সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১, ১৫৩; সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩; সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩, ৩৭।

[৫৫] তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর ইবন আইয়্যুব আয-যার‘ঈ। জন্ম ৬৯১ হিজরী, মৃত্যু ৭৫১ হিজরী। ইসলামের বড় আলেমগণের একজন। তাঁর অনেক গ্রহণযোগ্য রচনা রয়েছে।

[৫৬] মফিতাহু দারুস্ সা‘আদাহ, ২য় খণ্ড, ৩৮৩ নং পৃষ্ঠা এবং দেখুন: “আল জওয়াবুস সহীহ লমিান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ” ৪র্থ খণ্ড, ৩২২ নং পৃষ্ঠা ও শাইখ সাফারনিীর “লাওয়ামডিেল আনওয়ার” ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

[৫৭] ইবন তাইময়িয্যাহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬।

[৫৮] বস্তিারতি জানার জন্য, সফডিুর রহমান মুবারকপুরী কৃত আর-রাহীকুল মাখতুম দখো যতেে পার।

[৫৯] কুরআন সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন।

[৬০] দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া খণ্ড ৪, পৃ. ২০১, ২১১; সামুওয়াল আল-মাগরিবী কৃত, ইফহামুল ইয়াহূদ, (যিনি ইয়াহূদী ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) পৃ. ৫৮-৫৯।

[৬১] আলী ইবন রাব্বান আত-ত্বাবারী লিখিত ‘‘আদদীন ওয়াদ্ দাওলা ফী ইসবাতি নবুওয়্যতি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ’’ পৃ. ৪৭ এবং দেখুন: ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘আল-ই‘লাম’’ পৃ. ৩৬২ এবং তার পরে----।

[৬২] এটি হয়েছিল হিজরতের ৬ষ্ঠ বছর এবং তা ১০ বৎসরের জন্য; দেখুন: ফাতহুল বারী, পৃ. ৩৪।

[৬৩] সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদের বর্ণনায় এখানে ‘আরসিয়্যিীন এসেছে।

[৬৪] দেখুন: সহীহ বুখারী, কিতাবু বাদউল অহী।

[৬৫] মুবাশশির আত-ত্বরিাযী আল-হুসাইনী লিখিত “আদ-দীন আল ফিতরী আল-আবাদী”, ২য় খণ্ড, ৩১৯ নং পৃষ্ঠা।

[৬৬] দেখুন, আল আক্বীদাতু ত্বহাওয়িয়্যিাহ, ১৫৬ নং পৃষ্ঠা; লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যিাহ ২য় খণ্ড; ২৬৯, ২৭৭ পৃষ্ঠা; মাবাদিউল ইসলাম, ৬৪নং পৃষ্ঠা।

[৬৭] ইঞ্জিল মাত্তা, ২১: ৪২।

[৬৮] দেখুন: ইবরাহীম খলীল আহমাদ রচিত “তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম” ৭৩ নং পৃষ্ঠা। আর হাদীসটি মারফূ সূত্রে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী, কিতাবুল মানাক্বিব, অনুচ্ছেদ নং ১৭, হাদীসের শব্দাবলি তাঁরই এবং ইমাম মুসলিম, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, হাদীস নং ২২৮৬, আর মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, ২৫৬, ৩১২ নং পৃষ্ঠায়।

[৬৯] মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, ৪১১, ৪১২ নং পৃষ্ঠা। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল

মাসাজদি, হাদীস নং ৫২৩, আর হাদীসরে শব্দাবলি তারই।

[৭০] মাবাদউিল ইসলাম, পৃ. ৩ ও ৪।

[৭১] মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, ৩ নং পৃষ্ঠা এবং ইবন হবি্বান, ১ম খণ্ড, ৩৭৭ নং পৃষ্ঠা।

[৭২] মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ নং পৃষ্ঠা। ইমাম হাইসামি রচতি আল-মাজমা‘ ১ম খণ্ড, ৫৯ নং পৃষ্ঠা। ইমাম আহমাদ ও ইমাম ত্বাবারানী আল-জামউেল কাবীরে অনুরূপ বর্ণনা করনে এবং তার সকল বর্ণনাকারী নরি্ভরযোগ্য। আরও দখেুন, দখেুন:

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহহাব রচিত “ফাদ্বলুল ইসলাম” ৮ নং পৃষ্ঠা।

[৭৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮।

[৭৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০, ৬৪৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯।

[৭৫] ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তাদমুরিয়্যহ ১০৯-১১০।

[৭৬] শাইখ মোস্তফা আস্ সুবায়ী প্রণীত “আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্তাশরীঈল ইসলামী” ৩৭৩ নং পৃষ্ঠা।

[৭৭] দু’ ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ কোনো কোনো সংস্করণে নেই। তবে তা থাকা উচিত বলে মনে হয়। -সম্পাদক

[৭৮] দেখুন: ইবরাহীম খলীল আহমাদ রচিত “আল-মুসতাশরিকুন ওয়াল মুবাশশিরুন ফিল ‘আলামিল আরাবী ওয়াল ইসলামী গ্রন্থ।

[৭৯] ড. জাফরী লাং রচিত “আসসিরো‘উ মিনি আজলিল ঈমান” অনুবাদ- ড. মুনযির আল-আবসী, দারুল ফিকির প্রকাশনা: ৩৪ নং পৃষ্ঠা।

[৮০] দেখুন: মোরিস বুকাইল রচিত “আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন” ১৩৩-

২৮৩ পৃষ্ঠা, তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী একজন ডাক্তার ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

[৮১] মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ; সুন্নাহ’র অপরিহার্যতা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৪৬০৪, ৪র্থ খণ্ড, ২০০ নং পৃষ্ঠা।

[৮২] সহীহ বুখারী; আযান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ১৮, হাদীস নং ৬৩১।

[৮৩] ফলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই অনন্য ইলমী পদ্ধতি এবং এই

নিয়ন্ত্রণের কারণে, মুসলিমদের মাঝে ‘ইলমুল জারহি ওয়াত্ তা‘দীল” এবং “মুসত্বলাহুল হাদীস” নামে এক প্রসিদ্ধ বিদ্যার সৃষ্টি হয়, এই দু’টি বিদ্যা ইসলামী উম্মাহ’র এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা পূর্বে আর কোনো দিন ছিল না।

[৮৪] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, শাইখুল ইসলাম, মুজাদ্দিদ, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব এর আত-তাওহীদ, আল-উসূলুস সালাসা, আদাবুল মাশই ইলাস সালাত। অনুরূপ আব্দুর রহমান আল-উমরের দীন আল-হক। মুহাম্মাদ ইবন আলী ‘আরফাজ এর ‘মা লাবুদ্দা

মা‘রিফাতুহু ‘আনিল ইসলাম। শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন জারুল্লাহ আলে জারুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ্ এর ‘আরকানুল ইসলাম। একদল তালেবে ইলম রচিত ‘শারহু আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, যা পুনর্পাঠ করেছেন শাইখ আব্দুল্লাহ আল-জিবরীন।

[৮৫] দীন আল-হক্ব পৃ. ৩৮।

[৮৬] কুওয়াতু উয়ূনুল মুওয়াহহিদীন, পৃ. ৬০।

[৮৭] দীন আল-হক্ব পৃ. ৫১-৫২।

[৮৮] আরো দেখুন: শাইখ আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ লিখিত

“কাইফিয়্যাতু সালাতিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম”।

[৮৯] দেখুন, মিফতাহু দারুস সা‘আদাহ ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃ.

[৯০] আরো দেখুন: শাইখ আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ লিখিত “রিসালাতানি ফিয যাকাত ওয়াস সিয়াম”।

[৯১] মিফতাহু দারুস সাআদাহ ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃ.

[৯২] আরো দেখুন: একদল উলামা পরিষদ কর্তৃক লিখিত “দালীলুল হাজ্জি ওয়াল মু‘তামিরি” এবং শাইখ আবদুল্লাহ আযীয ইবন বায

রাহিমাহুল্লাহ লিখিত “আত-তাহকীকু ওয়াল ইযাহু লি কাছীরিন মিনাল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি”।

[৯৩] প্রাগুক্ত: ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ এবং দীন আল-হক, পৃ. ৬৮।

[৯৪] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ’র আল-উবুদিয়্যাহ।

[৯৫] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০০৬।

[৯৬] সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ২৯; সহীহ মুসলিম, কিতাবুয

যাকাত, হাদীস নং ১০০৮। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

[৯৭] আরো অধিক দেখুন: শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন প্রণীত "শারহু উসূলিল ঈমান", শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত "আল-ঈমান", শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন প্রণীত "আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ"।

[৯৮] দেখুন: আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ, পৃ. ৭, ১১।

[৯৯] দেখুন: আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ, পৃ. ৪৪ এবং মাবাদিউল ইসলাম, পৃ. ৮০, ৮৪।

[১০০] বিস্তারিত দেখুন, আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ, পৃ. ১৯।

[১০১] [যেমন বলা হয়, লুকের ইঞ্জীল, মথির ইঞ্জীল ইত্যাদি]

[১০২] দেখুন: দীন আল-হক্ব, পৃ. ১৯।

[১০৩] দেখুন: আল-আক্বীদাতুস সহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা, পৃ. ১৯; আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল্ জামাআহ, পৃ. ৩৯ এবং দীনুল হক, পৃ. ১৮।

[১০৪] মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড; পৃ. ২৯৩; তিরমিযী, কিয়ামত অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬।

[১০৫] দেখুন: জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১২৭।

[১০৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী লিখিত, আদ-দুররাতুল মুখতাসারাতু ফী মাহাসিনিদ দীনিল ইসলামী; শাইখ আব্দুল আযীয আস-সালমান লিখিত, মাহাসিনুল ইসলাম।

[১০৭] দেখুন: মিফতাহু দারিস সা'আদাহ: ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪ ও ৩৭৫।

[১০৮] দেখুন: ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত “আল- ই‘লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল আওহাম, পৃ. ৪৪২-৪৪৫।

[১০৯] মুসনাদে ইমাম আহমাদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯৮; সুনানে তিরমিযী, অনুচ্ছেদ: সিফাতুল কিয়ামাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৯; ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৯১।

[১১০] আসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন পৃ. ৭৬। ঈষৎ পরিবর্তিত।

[১১১] ইবনুল কাইয়্যিম, আল-ফাওয়ায়েদ পৃ. ১১৬।

[১১২] মুহাম্মাদ আসাদ, আত-তারীক ইলাল ইসলাম পৃ. ১৪০, ঈষৎ পরবির্তিত।

[১১৩] দেখুন: মফিতাহু দারসি সা‘আদাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৮, ৩৭০।

[১১৪] মুসনাদে আবু ইয়া‘লা, খণ্ড ৬, পৃ. ১৫৫; ত্বাবারানী আল-মুজামুল আওসাত, খণ্ড ৭, পৃ. ১৩২; মু‘জামুস সাগীর, খণ্ড ২, পৃ. ২০১; আদ-দ্বয়িাউ ফলি মুখতারাহ, ৫/১৫১, ১৫২, তনিি বলনে, এর সনদ সহীহ; আল-মাজমু‘, খণ্ড ১০, পৃ. ৮৩।

[১১৫] ইবন আবু আসমে, আল-আহাদ ওয়াল মাছানি, খণ্ড ৫, পৃ. ১৮৮;

ত্বাবারানী আল-মুজামুল আওসাত, খণ্ড ৭, পৃ. ৫৩, ৩১৪; আল-হাইছামী আল-মাজমা‘ এর মধ্যে বলেন, খণ্ড ১, পৃ. ৩২।

[১১৬] ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ রচিত “আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ৫৬ (কিছু পরিবর্তিত)।

[১১৭] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০০৬।

[১১৮] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, অনুচ্ছেদ: তাহরীমুয যুলমি, হাদীস নং ২৫৭৭।